স্বামী স্ত্রীর অধিকার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৭৮

প্রকাশকাল ঃ জুন ১৯৯২

১৪শ প্রকাশ

শাওয়াল	১৪৩৪
ভাদ্র	১৪২০
সেপ্টেম্বর	২০১৩

বিনিময় ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

حقوق الزوجين-এর বাংলা অনুবাদ

SWAMI-STREER ADHIKAR by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 110.00 Only

আমাদের কথা

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পুনরায় তার প্রকৃত রূপ ও চিত্রসহ আধুনিক বিশ্বের নিকট তুলে ধরেছেন, যা বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে চাপা পড়েছিল। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্মাণে ইসলামী শরীয়াতের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা তিনি পেশ করে গেছেন।

বর্তমান গ্রন্থটিতে তিনি ইসলামের দাম্পত্য বিধান তুলে ধরেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগ্রন্থ। এসব বিধান অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই জরুরী।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী আল্লামার সবগুলো গ্রন্থই বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে হাযির করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মাওলানার 'হুকূকুয যাওযাইন' গ্রন্থটি আমরা 'স্বামী-স্ত্রীর অধিকার' নাম দিয়ে বাংলা ভাষায় পাঠকদের সামনে পেশ করতে পারায় আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছি।

এ গ্রন্থের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের দাম্পত্য বিধান উপলব্ধির তাওফীক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ডিরেক্টর
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

ভূমিকা

১৯৩৩/৩৪ সালের কথা। হায়দরাবাদ, ভূপাল এবং বৃটিশ ভারতে খুব জোরেশোরে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলো যে, বর্তমান প্রচলিত আইনের ত্রুটির কারণে দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করার জন্য এবং ইসলামী শরীয়াতের নির্দেশসমূহকে সঠিক পন্থায় কার্যকর করার জন্য কোনো ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা চালানো দরকার। সুতরাং এ বিষয়টি সামনে রেখে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আইনের খসড়াসমূহ প্রণীত হতে থাকে এবং কয়েক বছর যাবত এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ সময়ে আমি অনুভব করি, বিষয়টির এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যার প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। সুতরাং আমি হিজরী ১৩৫৪ (১৯৩৫ খৃ.) সনে حقوق الزوجين। (স্বামী-স্ত্রীর অধিকার) শিরোনামে 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। এ প্রবন্ধে ইসলামের দাম্পত্য আইনের প্রাণসত্তা এবং এর মূলনীতি বিশদভাবে বর্ণনা করার সাথে সাথে কুরআন-হাদীসে আমরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য যেসব নির্দেশ পাই, তাও বিশ্লেষণ করি। মুসলমানদের বর্তমান আইনগত সমস্যাসমূহের সঠিক পদ্ধতিতে সমাধান করার জন্য আমি কতকগুলো পরামর্শও পেশ করি। এ ধারাবাহিক প্রবন্ধটি মূলত আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লেখা হয়েছিল। কিন্তু আলোচনায় এমন কতকগুলো বিষয়ও এসে গেছে যা সাধারণ পাঠকেরও উপকারে আসবে। বিশেষ করে যেসব লোক আমার 'পর্দা' গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য যেসব বিধি-নিষেধ রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবেন এবং ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হবেন। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে এ ধারাবাহিক প্রবন্ধের সাথে আরো কিছু জরুরী বিষয় যোগ করে এখন তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আবুল আ'লা

২৮ সফর, ১৩৬২
৫ মার্চ, ১৯৪৩

উর্দু কিতাবের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

সতের বছর পূর্বে এ পুস্তক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গত দশ বছর যাবত তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যদিও প্রথম দিনই একথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছিল যে, এ প্রবন্ধের হানাফী ফিক্‌হের অন্তর্গত দাম্পত্য আইনের সংশোধনের জন্য যেসব পরামর্শ দেয়া হয়েছে—তা ফতোয়ার আকারে নয়, বরং এগুলো পরামর্শের আকারে আলেম সমাজের সামনে এ উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছিল যে, তাঁরা যদি এগুলোকে শরয়ী ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিক মনে করেন তাহলে সেই অনুযায়ী ফতোয়ার মধ্যেও পরিবর্তন আনবেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এ পরামর্শের ওপর গভীরভাবে চিন্তাও করা হয়নি, আর কেউ এর ওপর জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা করার কষ্টও স্বীকার করেননি। অবশ্য এটাকে আগেও আমার সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এখনো তাই করা হচ্ছে।

এখন পুনর্বার অধ্যয়ন করার সময় অনেক ক্ষেত্রে আংশিক সংশোধনের সাথে সাথে আমি এর দুটি আলোচনার সাথে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী দলীল-প্রমাণ সংযোজন করে দিয়েছি। পূর্বে তা এতটা শক্তিশালী দলীল সহকারে পেশ করা হয়নি। বিষয় দুটি হচ্ছে, 'ঈলা' এবং 'বিলায়েতে আজবার' (অভিভাবকের ক্ষমতা প্রয়োগ)। অবশিষ্ট কোনো কোনো ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের অপবাদ সত্ত্বেও আমি কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি।

আবুল আ'লা

১৭ রমযান, ১৩৭১
১১ জুন, ১৯৫২

সূচীপত্র

সূচনা

যে কোনো সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন। এক ঃ এমন একটি পূর্ণাংগ আইন ব্যবস্থা—যা তার বিশেষ সংস্কৃতির মেজাজের দিকে লক্ষ রেখে তৈরি করা হয়েছে। দুই ঃ যে দৃষ্টিভংগী সামনে রেখে এ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে ঠিক তদনুযায়ী তা কার্যকর করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা বর্তমানে এ দুটি জিনিস থেকেই বঞ্চিত। নিসন্দেহে তাদের কাছে বইয়ের আকারে এমন একটি আইন-বিধান মওজুদ রয়েছে যা ইসলামী সংস্কৃতি ও তার স্বভাবের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং সামাজিকতা ও সংস্কৃতির সব দিক ও বিভাগে তা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এ বিধান বর্তমানে কার্যত রহিত হয়ে আছে। তদস্থলে এমন একটি আইন-বিধান তার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব করছে যা সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক ব্যাপারেই সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী। যদি কোথাও তার কিয়দংশ ইসলাম মোতাবেক হয়েও থাকে, তবে তা অসম্পূর্ণ।

মুসলমানরা বর্তমানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন, তা কার্যত তাদের সামাজিক জীবনকে দু টুকরা করে ফেলেছে। এর এক শাখা হচ্ছে, এ রাষ্ট্রব্যবস্থা উপমহাদেশের অন্য জাতির সাথে মুসলমানদের ওপরও এমন সব আইন-কানুন চাপিয়ে দিয়েছে যা ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে আদৌ সামঞ্জস্যশীল নয়। দ্বিতীয় শাখার আওতায় এ রাষ্ট্রব্যবস্থা মৌলিক-ভাবে মুসলমানদের এ অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর করা হবে। কিন্তু কার্যত এ শাখার অধীনেও ইসলামী শরীয়াতকে সঠিকভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। 'মুহাম্মাদী ল' নামে যে আইন এ শাখার অধীনে কার্যকর করা হয়েছে তা তার নিজস্ব রূপ ও প্রাণ উভয় দিক থেকেই মূল ইসলামী শরীয়ত থেকে অনেকটা ভিন্নতর। সুতরাং তার প্রয়োগকে সঠিক অর্থে ইসলামী শরীয়তকে কার্যকর করা হয়েছে বলা চলে না।

এ দুঃখজনক পরিস্থিতি মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যেসব ক্ষতি করেছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, এ রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের অন্তত শতকরা পঁচাত্তর ভাগ পরিবারকেই জাহান্নামের

প্রতীকে পরিণত করে দিয়েছে এবং আমাদের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের জিন্দেগীকে তিক্ত তথা ধ্বংস করে দিয়েছে।

নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক মূলত মানবীয় সমাজ-সংস্কৃতির 'ভিত্তিপ্রস্তর'। যে কোনো ব্যক্তি, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী, দাম্পত্য সম্পর্ককে সুসংহত করার জন্য রচিত আইনের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না। কেননা শৈশবকাল থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে এ বিধান কোনো না কোনো অবস্থায় মানব জীবনের ওপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে আছে। যদি সে শিশু হয়ে থাকে তাহলে তার পিতা-মাতার সম্পর্ক তার লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণে প্রভাব বিস্তার করবে। যদি সে যুবক হয়ে থাকে তাহলে একজন জীবন-সংগিনীর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর যদি সে বয়োবৃদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তার সন্তানগণ এ বৈবাহিক সম্পর্কের বন্দীদশায় তাকে আবদ্ধ করে রাখবে। তার অন্তর ও মনের শান্তি তথা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা পুত্র-পুত্রবধূ এবং মেয়ে-জামাইয়ের সাথে উত্তম সম্পর্কের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকবে।

মোটকথা দাম্পত্য বিধান এমনই এক আইন-বিধান, যা সামাজিক বিধানসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী। ইসলামে এ বিধানের মৌলিক গুরুত্বের দিকে লক্ষ রেখে তা অত্যন্ত নির্ভুল বুনিয়াদের ওপর রচনা করা হয়েছে এবং মুসলমানরা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের দীনের মধ্যে একটি উত্তম, পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ বিধান লাভ করেছিল এবং তা যে কোনো দিক থেকে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মের বৈবাহিক বিধানগুলোর তুলনায় অধিক উত্তম বলা যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বিধানটিও 'মুহাম্মাদী ল'-এর প্রেতাত্মার খপ্পরে পড়ে এমনভাবে বিকৃত হলো যে, তার মধ্যে এবং ইসলামের মূল বৈবাহিক বিধানের মধ্যে দূরতম সাদৃশ্যমাত্র অবশিষ্ট থাকলো।

বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের নামে মুসলমানদের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে আইন চালু রয়েছে তা যেমন সুষ্ঠু নয়, তেমনি অর্থবহও নয়, পরিপূর্ণও নয়। এ আইনে ত্রুটি ও অপূর্ণতা মুসলমানদের সামাজিক জীবনের ওপর এত বেশী ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সম্ভবত অন্য কোনো আইনের দ্বারা এতটা ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। এ ত্রুটিপূর্ণ আইনের মাধ্যমে কোনোরূপ ধ্বংস ও বিপর্যয় সাধিত হয়নি এরূপ একটি সৌভাগ্যবান পরিবার এ উপমহাদেশে অতি কষ্টেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জান-প্রাণ ধ্বংস হওয়া একটা সামান্য ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ হচ্ছে—

এ কালা-কানুনের কুফল অসংখ্য মুসলমানের সম্ভ্রমবোধকে বিলীন করে দিয়েছে, তাদের ঈমান ও চরিত্র-নৈতিকতা বরবাদ করে দিয়েছে। যেসব ঘর ছিল তাদের দীন ও সংস্কৃতির সুরক্ষিত দুর্গ, তা সেগুলোর মধ্যেও অশ্লীলতা ও ধর্মচ্যুতির সয়লাব পৌছে দিয়েছে। আইন-কানুন এবং তা বলবৎকারী যন্ত্রের ত্রুটির ফলে যেসব অকল্যাণ দেখা দিয়েছে, দুটি কারণে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক ঃ দীনী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব

এর ফলে মুসলমানরা ইসলামের দাম্পত্য আইনের সাথে এতই অপরিচিত হয়ে পড়েছে যে, বর্তমানে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও এ আইনের সাধারণ মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কেও অবহিত নয়।[১] ব্যাপক-ভাবে জানা তো দূরের কথা, এর মূলনীতিটুকু জানার এবং বুঝার মতো মুসলমানও খুব কমই পাওয়া যাবে। এমনকি যেসব লোক বিচারালয়ের কুরসীতে বসে তাদের বিয়ে-তালাক সংক্রান্ত মোকদ্দমার মীমাংসা করে থাকেন তাঁরাও ইসলামের দাম্পত্য আইনের প্রাথমিক জ্ঞান থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। এ ব্যাপক মূর্খতা মুসলমানদের এমনভাবে পংগু করে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবেও ইসলামী আইনের যথাযথ অনুসরণ করতে পারছে না।

দুই ঃ অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব

এর ফলে মুসলমানদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল ইসলামের দাম্পত্য আইনের মূলনীতি ও ভাবধারার পরিপন্থী অসংখ্য রসম-রেওয়াজ, ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশই ঘটেনি, বরং সাথে সাথে তাদের একটা বিরাট অংশের মন-মগজ থেকে বৈবাহিক জীবনের ইসলামী দৃষ্টিকোণই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেল। কোথাও হিন্দুদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, স্ত্রীকে দাসী

---

১. উদাহরণস্বরূপ এটা মূর্খতারই ফল যে, মুসলমানরা সাধারণত তালাক দেয়ার একটি মাত্র নিয়মের সাথেই পরিচিত। তা হলো, একই সাথে তিন তালাক ছুঁড়ে মারা। এমনকি যাঁরা তালাকনামা লিখে থাকেন তাঁরাও তখন তিন তালাক লিখে দেন। অথচ এটা হচ্ছে ইসলামের বিদআত এবং শক্ত গুনাহের কাজ। এর ফলে বড় রকমের আইনগত জটিলতাও সৃষ্টি হয়। লোকেরা যদি জানতো, যে উদ্দেশ্যে তিন তালাক দেয়া হয় তা এক তালাক দেয়ার মাধ্যমেও হাসিল করা যায় এবং এ অবস্থায় ইদ্দাত চলার সময়ের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করে এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার সময় পুনরায় বিবাহ করার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে অসংখ্য পরিবার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার সুযোগ পেত। একইভাবে অনেক আল্লাহর বান্দা মিথ্যা ছল-চাতুরী এবং আইন ভংগের অপরাধ থেকে বেঁচে যেত।—গ্রন্থকার

এবং স্বামীকে প্রভু তথা দেবতা জ্ঞান করা হয়। আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে না হলেও কার্যক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন কখনো ছিন্ন করা চলে না। তালাক ও খোলার প্রথা এতটা লজ্জা ও অপমানের ব্যাপার হয়ে পড়েছে যে, কোথাও এর প্রয়োজন হলে কেবল এ কারণে বর্জন করা হয় যে, এতে সম্মান ও সম্ভ্রমের হানি হয়, যদিও পর্দার অন্তরালে তালাক ও খোলার চেয়েও নিকৃষ্টতর অনেক কিছুই ঘটতে থাকে। তালাক প্রতিরোধের জন্য মোহরানার পরিমাণ এত অধিক করা হয় যে, স্বামী যেন কখনো তালাক দেয়ার সাহসও করতে না পারে এবং অনৈক্যের সময় স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। স্বামী পূজা স্ত্রীদের গৌরব ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে শামিল হয়ে পড়েছে। কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও সে কেবল সামাজিক নিন্দা ও তিরস্কারের ভয়ে তালাক অথবা খোলার নাম মুখেও আনতে পারে না। এমনকি স্বামী যদি মরে যায় তবুও হিন্দু নারীদের মত স্বামীর নাম জপ করে বসে থাকাই তার নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়াটা কেবল তার জন্য নয়, বরং তার গোটা বংশের জন্য অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত নব্য বংশধরদের অবস্থা হলো- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -কুরআনের এ আয়াতটি তারা বেশ জোর গলায় উচ্চারণ করে।[২] কিন্তু لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ আয়াতে পৌছে হঠাৎ তাদের সুর নিচু হয়ে যায়[৩] এবং যখন اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ আয়াতটি তাদের সামনে এসে যায় তখন তারা সাধ্যমত চেষ্টা করে, কিভাবে এ আয়াতটি কুরআন মজীদ থেকে 'খারিজ' করে দেয়া যায়।[৪] তারা এ আয়াতের আজগুবি ব্যাখ্যা পেশ করে। তারা এ উদ্ভট ব্যাখ্যার অন্তরালে একথাও বলে যে, তারা মানসিকভাবে ভীষণ লজ্জিত। তাদের ধর্মের পবিত্র কিতাবে এ ধরনের আয়াত রয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে, ইউরোপীয় সভ্যতা নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ছক এঁকেছে, তাতে তারা আতংকিত হয়ে পড়েছে এবং তাদের মাথায় ইসলামের পূর্ণাংগ, মজবুত ও যুক্তিসংগত মূলনীতিগুলো অনুধাবন করার কোনো যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকেনি, যার ওপর সে তার সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

---

২. "নারীদের ওপর পুরুষদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তদ্রূপ তাদের ওপরও নারীদের ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

৩. "অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।"-সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

৪. "পুরুষরা হচ্ছে নারীদের পরিচালক।"-সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এরূপ নানাবিধ কারণ পুঞ্জীভূত হয়ে মুসলমানদের পারিবারিক জীবনকে ততটা বিপথগামী করে ফেলেছে—কোনো এক যুগে তা যতটা উত্তম ছিল। বিদেশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার জট খুলতে বর্তমান আইন ও আইন প্রয়োগকারী যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয়ে পড়েছে। এ অপারগতা এসব জটিলতাকে আরো জটিল করে তুলছে। অজ্ঞতার কারণে মুসলমানদের একটি দল এ ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে পড়েছে যে, ইসলামী আইনের ত্রুটির কারণেই এসব বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য একটি নতুন আইন-বিধান প্রণয়ন করার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামে এমন একটি পরিপূর্ণ দাম্পত্য বিধান মওজুদ রয়েছে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর জন্য ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অধিকারসমূহ পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং সীমালংঘনের ক্ষেত্রে (চাই তা স্ত্রীর পক্ষ থেকে ঘটুক অথবা স্বামীর পক্ষ থেকে) তার প্রতিকারের জন্য অভিযোগ পেশ করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেখানে কোনো সমস্যা বাকি রাখা হয়নি যার সমাধান ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে করা হয়নি।

অতএব মুসলমানদের জন্য নতুন কোনো বিধানের আদৌ প্রয়োজন নেই। যে জিনিসটির প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে তা হচ্ছে—ইসলামের দাম্পত্য বিধানকে তার স্বরূপে পেশ করতে হবে এবং তাকে সঠিকভাবে কার্যকর করার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য এটা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে আলেম সমাজের। তাঁরা অবিচল তাকলীদের পথ পরিহার করে বর্তমান যুগের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে ইসলামের দাম্পত্য বিধানকে এমনভাবে ঢেলে সাজাবেন যেন মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যাসমূহের বর্তমান জটিলতার পূর্ণাংগ সমাধান করা যায়। অতপর মুসলমান সর্বসাধারণকে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এর ফলে তারা নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাকে সমস্ত জাহিলী রসম-রেওয়াজ ও দৃষ্টিভংগী থেকে পবিত্র করতে পারবে, যা তারা ইসলাম বিরোধী সমাজব্যবস্থা থেকে গ্রহণ করেছিল এবং তারা ইসলামী আইনের মূলনীতি ও ভাবধারা অনুধাবন করে তদনুযায়ী নিজেদের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিবে। এছাড়া এমন একটি সুশৃংখল ও সুসংগঠিত 'বিচার বিভাগে'র প্রয়োজন, যা স্বয়ং এ আইনের ওপর ঈমান রাখে এবং যার বিচারকদেরও জ্ঞান ও নৈতিকতার দিক থেকে এরূপ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা এ আইনকে দুনিয়ার অন্যান্য আইনের প্রেরণায় নয়, বরং ইসলামের নিজস্ব প্রেরণা ও ভাবধারায় কার্যকর করবে।

এ কিতাবটি সেই প্রয়োজন সামনে রেখেই লেখা হয়েছে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমি ইসলামের দাম্পত্য আইনের একটি পূর্ণাংগ রূপরেখা পেশ করতে চাই। তাতে এ আইনের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও ধারাসমূহ যথাযথ স্থানে বর্ণনা করা হবে। প্রয়োজনবোধে আমি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের সিদ্ধান্তের উদাহরণ এবং পরবর্তী যুগের ইমামদের ইজতিহাদী রায়ও নকল করবো। এতে খুঁটিনাটি মাসয়ালাসমূহ বের (ইস্তিম্বাত) করা সহজ হবে। পরিশেষে এমন কতগুলো প্রস্তাব পেশ করা হবে যাতে ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় বিষয়ে জটিলতা অনেকাংশে দূরীভূত হতে পারে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তী বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তনই হচ্ছে এসব জটিলতার আসল ও সঠিক চিকিৎসা, কিন্তু তবুও এখানে আমি এমন কতগুলো বিষয় বলে দিতে চাচ্ছি যেগুলো দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির দোষ-ত্রুটিগুলো তুলনামূলকভাবে শরীয়তের সঠিক নিয়মে দূর করা যেতে পারে। তাহলে যাঁরা এসব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছেন তাঁরা ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এমন পথ গ্রহণ করবেন, যার কিছুটা অন্তত শরীয়ত মোতাবেক হবে।

❐

দাম্পত্য আইনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য

আইনকে ব্যাপকভাবে জানার পূর্বে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই নীতিমালা নির্ধারণ করা হয় এবং নীতিমালার অধীনেই আইনের নির্দেশাবলী ও ধারাসমূহ বিবৃত হয়। যদি কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্যকে না বুঝেই নির্দেশকে কার্যকর করে, তাহলে ছোটখাট সমস্যার ক্ষেত্রে এমন সব রায় দিয়ে বসার খুবই আশংকা রয়েছে যার ফলে আইনের মূল উদ্দেশ্যই বিলীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হবে না সে আইনের সঠিক ভাবধারা অনুযায়ী তার অনুসরণও করতে পারবে না। অতএব যেসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইসলামে দাম্পত্য বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে আমরা প্রথমে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

নৈতিক চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযত

ইসলামের দাম্পত্য আইনের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও নৈতিকতার হেফাযত করা। এ আইন যেনাকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং মানব জাতির উভয় শ্রেণীর স্বভাবগত সম্পর্ককে এমন এক আইন কাঠামোর অধীন করে দেয়ার জন্য বাধ্য করেছে যা তাদের চরিত্রকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে এবং সমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবে। এজন্যই কুরআন মজীদে 'নিকাহ' শব্দকে ইহসান (احصان) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। হিস্ন (حصن) শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দুর্গ' আর ইহসান শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দুর্গে আবদ্ধ হওয়া'। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করে সে হচ্ছে মোহসিন অর্থাৎ সে যেন একটি দুর্গ নির্মাণ করছে। আর যে স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয় সে হচ্ছে মোহ্সিনা অর্থাৎ বিবাহের আকারে তার নিজের ও নিজ চরিত্রের হেফাযতের জন্য যে দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে তাতে আশ্রয় গ্রহণকারিণী। এ রূপক উদাহরণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযত করাই হচ্ছে ইসলামের বিবাহ ব্যবস্থার সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য। আর দাম্পত্য আইনের প্রথম কাজ হচ্ছে এ দুর্গকে সুদৃঢ় করা যা বিবাহের আকারে চরিত্র ও সতীত্বের এ মহামূল্যবান রত্নকে হেফাযত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ـ

"এ মুহরিম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্য সব মহিলা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা করো। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌনচর্চার প্রতিরোধের জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করেছ তার বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী তাদের মোহরানা পরিশোধ করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

আবার স্ত্রীলোকদের জন্য বলা হয়েছে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ط ـ النساء : ٢٥

"অতএব তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে তাদের বিবাহ করো এবং ন্যায়সংগত পরিমাণে মোহরানা আদায় করো, যাতে তারা সতীসাধ্বী হয়ে থাকে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে যেনা করে না বেড়ায়।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط........................وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط ـ المائدة : ٥

"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা হলো। .... আর ঈমানদার সতী নারী এবং তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবদের সতী নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। তবে শর্ত হচ্ছে—তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে চুরি করে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫

এসব আয়াতের শব্দ ও অর্থ নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ইহ্সান অর্থাৎ 'চরিত্র ও সতীত্বের পূর্ণ হেফাযতই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' এটা এমনি এক মহান উদ্দেশ্য যার জন্য অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যকে কুরবানী করা যেতে পারে। কিন্তু অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যের জন্য এ উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। স্বামী-স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তারা যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাদের স্বভাবসুলভ যৌন স্পৃহা পূর্ণ করে। কিন্তু যদি কোনো বিবাহের বন্ধনে (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যদ্দরুন আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে এ বিবাহের বাহ্যিক বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য তাঁর নির্ধারিত অন্যান্য সীমারেখা লংঘন করার পরিবর্তে বরং এগুলোর হেফাযতের জন্য বিবাহ বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়াই অধিক উত্তম। এজন্যই ঈলাকারীদের[৫] নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন চার মাসের অধিক নিজেদের প্রতিজ্ঞার ওপর অবিচল না থাকে। স্বামী যদি চার মাস অতিক্রমের পরও স্ত্রীর কাছে প্রত্যাবর্তন না করে তাহলে সে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক, তাকে বিবাহের বন্ধনে আটকে রাখার কোনো অধিকার তার নেই। কেননা তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, স্ত্রীলোকটি তার প্রাকৃতিক দাবি পূরণের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করতে বাধ্য হবে। আল্লাহর আইন কোনো অবস্থায়ই তা সহ্য করতে পারে না। অনুরূপভাবে যারা একাধিক মহিলাকে বিবাহ করে, তাদেরকে কঠোরভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط - النساء : ١٢٩

"তোমরা এক স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপর স্ত্রীর দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়ো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

এ নির্দেশেরও উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো স্ত্রী যেন এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করতে বাধ্য না হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে দাম্পত্য জীবনের বাহ্যিক বন্ধন অটুট রাখার পরিবর্তে তা ভেংগে দেয়াই উত্তম। এর ফলে স্ত্রীলোকটি বন্ধনমুক্ত হয়ে তার পসন্দসই অন্য পুরুষকে বিবাহ করার সুযোগ পাবে। এ একই উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে 'খোলা' করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। কোনো স্ত্রীলোকের এমন ব্যক্তির কাছে থাকা—যাকে সে আদৌ পসন্দ করে না অথবা যার কাছে সে মানসিক শান্তি পায় না—এটা

৫. ঈলা শব্দের ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনে সূরা বাকারার ২২৬ আয়াত ও ২৪৫ টীকা এবং এ পুস্তকের 'ঈলা' অনুচ্ছেদ দেখুন।–অনুবাদক

তাকে এমন অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে যার ফলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ ধরনের স্ত্রীলোককে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে মোহরানার আকারে স্বামীর কাছ থেকে যে অর্থ পেয়েছিল তার সম্পূর্ণটা অথবা কিছু কমবেশী তাকে ফেরত দিয়ে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

ইসলামী আইনের এ ধারাগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এখানে উল্লিখিত উদাহরণসমূহ পেশ করে এ নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করাই উদ্দেশ্য যে, ইসলামী আইন চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযতকে সব জিনিসের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, যদিও তা বিবাহ বন্ধনকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে। কিন্তু যেখানে এ বন্ধন বহাল রাখলে চরিত্র ও সতীত্বের ওপর আঘাত আসার আশংকা দেখা দেয়, সেখানে এ মূল্যবান ঐশ্বর্যকে রক্ষা করার তাগিদেই বৈবাহিক বন্ধনের গিঁঠ খুলে দেয়াই সে জরুরী মনে করে। আইনের যে ধারাগুলো সামনে অগ্রসর হয়ে আলোচনা করা হবে তা অনুধাবন করার জন্য এবং সেগুলোকে আইনের স্পিরিট অনুযায়ী কার্যকর করার জন্য এ সূক্ষ্ম বিষয়টি উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করা একান্ত প্রয়োজন।

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জাতির উভয় শ্রেণীর লিংগের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে। বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে সমাজ ও সভ্যতার যে সমস্ত উদ্দেশ্য সংযুক্ত রয়েছে সেগুলোকে তারা নিজেদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার সাথে পূর্ণ করতে পারবে এবং পারিবারিক জীবনে তারা শান্তি, আনন্দ ও আরাম উপভোগ করতে পারবে। তাদের সামাজিক জীবনের মহান উদ্দেশ্যসমূহকে পূর্ণ করার জন্য শক্তি যোগাবার ক্ষেত্রে এসব জিনিসের খুবই প্রয়োজন। কুরআন মজীদে এ উদ্দেশ্যকে যে ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের দর্শনই হচ্ছে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা। স্বামী-স্ত্রীকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, একজন যেন অপরজনের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

অতএব এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۔ الروم : ٢١

"এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তার কাছে মানসিক শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا - الاعراف : ۱۸۹

"তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে একটি দেহ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য স্বয়ং সেই বস্তু থেকে তৈরি করেছেন একটি জোড়া, যেন তোমরা তার কাছ থেকে শান্তি ও আরাম হাসিল করতে পারো।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৯

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط - البقرة : ۱۸۷

"তারা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা হচ্ছো তাদের জন্য পোশাক।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

এখানে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলা হয়েছে। পোশাক হচ্ছে যা মানুষের শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে আবৃত করে রাখে এবং বাইরের অনিষ্টকর বস্তু থেকে হেফাযত করে। কুরআন মজীদে স্বামী-স্ত্রীর জন্য পোশাকের এ রূপক ব্যবহার করে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ব্যক্তিগত দিক থেকে তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত যেরূপ সম্পর্ক পোশাক ও শরীরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের অন্তর ও আত্মা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করবে এবং একজন অপর জনের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলংকের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এটাই হচ্ছে প্রেম, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার দাবি এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই হচ্ছে দাম্পত্য সম্পর্কের আসল প্রাণ। যদি কোনো দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এ প্রাণবস্তু না থাকে তাহলে সেটা যেন এক প্রাণহীন লাশ।

ইসলামে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে এ উদ্দেশ্যকেই সামনে রাখা হয়েছে। যদি স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করতে চায় তাহলে পারস্পরিক সমঝোতা, মিল-মহব্বতের সাথে একমুখী হয়ে বসবাস করবে, পরস্পরের ন্যায্য অধিকার আদায় করবে এবং উভয় উভয়ের সাথে উদার ব্যবহার করবে। কিন্তু যদি তারা এরূপ করতে অসমর্থ হয়,

তাহলে তাদের একত্রে বসবাস করার চেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই উত্তম। কেননা প্রেম ও আন্তরিকতার ভাবধারা খতম হয়ে যাওয়ার পর দাম্পত্য সম্পর্ক হবে একটি মৃতদেহ। যদি তা দাফন না করা হয় তাহলে এ থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সমস্ত পরিবেশটাই বিষময় ও দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। এ কারণে কুরআন মজীদ বলছে ঃ

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهٖ ط - النساء : ١٣٠

"যদি তোমরা আপোষে মিলেমিশে থাকো এবং পরস্পর সীমালংঘন করা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। যদি (তা সম্ভব না হয়) দম্পতি পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা আপন অসীম অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে উভয়কে সন্তুষ্ট করবেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯-১৩০

আবার জায়গায় জায়গায় আহ্কাম বর্ণনা করার সাথে সাথে তাকিদ করা হয়েছে ঃ

فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط - البقرة : ٢٢٩

"হয় ন্যায়সংগত পন্থায় তাকে ফিরিয়ে নিবে অথবা সৌজন্যের সাথে তাকে বিদায় দিবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ - الطلاق : ٢

"তোমরা হয় উত্তমভাবে তাদেরকে নিজেদের কাছে রাখবে অন্যথায় ন্যায়নীতির সাথে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে।"

–সূরা আত-তালাক ঃ ২

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - النساء : ١٩

" তোমরা স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط - البقرة : ٢٣١

"তোমরা হয় তাদেরকে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে নাও অন্যথায় উত্তম পন্থায় বিদায় দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য তাদের আটকে রেখো না।

কেননা এতে তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে সে নিজের ওপরই অত্যাচার করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ - البقرة : ٢٣٧

"তোমরা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহৃদয়দা দেখাতে কখনো ভুল করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

যেখানে 'রিযয়ী' (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে পুনরায় গ্রহণের জন্য সৎ উদ্দেশ্যের শর্ত আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ দুই তালাক দেয়ার পর এবং তৃতীয় তালাক দেয়ার পূর্বে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য হতে হবে সমঝোতা, মিল-মহব্বত ও আন্তরিকতার সাথে বসবাস করা, যাতনা দেয়া এবং ঝুলিয়ে রাখার জন্য নয়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ط - البقرة : ٢٢٨

"তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয় তাহলে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

অমুসলিমদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের কুফল

এ কারণেই মুসলিম নর-নারীকে আহলে কিতাব ছাড়া অন্য সব অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা নিজের ধর্ম, দৃষ্টিভংগী, সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবন যাপন প্রণালীর দিক দিয়ে মুসলমানদের থেকে তাদের সাথে এতটা পার্থক্য যে, কোনো খাঁটি মুসলমান আন্তরিক ভালোবাসা ও মন-প্রাণের একমুখিনতা নিয়ে তাদের সাথে মিলিত হতে পারে না।

এ বিরোধ সত্ত্বেও যদি তাদের পরস্পরের সাথে সংযোগ হয় তাহলে তাদের এ দাম্পত্য সম্পর্ক কোনো খাঁটি সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে স্বীকৃত হবে না, বরং তা হবে কেবল একটা যৌন সম্পর্ক। এ সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হবে না, আর হলেও তা ইসলামী সমাজ-সংস্কৃতি এবং স্বয়ং সেই মুসলমানের জন্য উপকারী না হয়ে উল্টো ক্ষতির কারণই হবে।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ط وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط - البقرة : ٢٢١

"তোমরা মুশরিক নারীদের কখনো বিবাহ করো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। বস্তুত একটি ঈমানদার দাসী একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারীর চেয়ে অনেক উত্তম, যদিও শেষোক্ত নারী তোমাদের অধিক পসন্দনীয়। তোমরা মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমাদের নারীদের বিবাহ দিও না, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে। কেননা একটি ঈমানদার দাস একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিকের চেয়ে অনেক উত্তম যদিও এ মুশরিক যুবকটি তোমাদের অধিক পসন্দনীয়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২১

আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে আইন যদিও এর অনুমতি দেয় যে, তাদের নারীদের বিবাহ করা যেতে পারে।[৬] সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌল চিন্তার ক্ষেত্রে এক পর্যায়ে আমাদের ও তাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামে এটাকে মনঃপূত দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা. আহলে কিতাবের এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিষেধ করলেন এবং নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে বললেন ঃ

اِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ -

"সে তোমাকে চরিত্রবান বানাতে পারবে না।"

একথার তাৎপর্য এই যে, এ অবস্থায় তাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না যা দাম্পত্য সম্পর্কের প্রাণ। হযরত হুযাইফা রা. এক ইহুদী নারীকে বিবাহ করতে চাইলেন। হযরত উমর রা. তাঁকে লিখে পাঠালেন, "এ ইচ্ছা পরিহার করো।" হযরত আলী রা. ও হযরত ইবনে উমর রা. আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করাকে সুস্পষ্ট ভাষায়

---

৬. এরপরও আহলে কিতাব পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীদের বিবাহ নিষিদ্ধ রয়েছে। কেননা নারীদের স্বভাবের মধ্যে সাধারণত প্রভাবান্বিত হওয়া এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী। অতএব একটি অমুসলিম পরিবার ও সমাজে অমুসলিম স্বামীর সাথে তার বসবাস করার কারণে এ আশংকা অনেক বেশী থাকে যে, সে তার স্বামীর চালচলন ও আদর্শ গ্রহণ করে বসবে। কিন্তু সে তাদেরকে স্বীয় আদর্শে প্রভাবান্বিত করতে পারবে এটা খুব কমই আশা করা যায়। এছাড়া যদি সে তাদের আদর্শ গ্রহণ নাও করে, তবুও এটা নিশ্চিত যে, তাদের এ সম্বন্ধ কেবল একটা জৈবিক সম্পর্ক হিসাবেই থেকে যাবে। অমুসলিম স্বামীর সাথে না তার ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারবে, না অমুসলিম পরিবার ও সমাজের সাথে তার কোনো ফলপ্রসূ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।–গ্রন্থকার

'মাকরূহ' বলেছেন। আলী রা. মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে নিম্নের আয়াত পেশ করেছেন :

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -

"যে ব্যক্তি মু'মিন সে এমন লোকদের সাথে ভালোবাসা স্থাপন করতে পারে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধী।"–সূরা মুজাদালা : ২২

সুতরাং দম্পতির মধ্যে যদি প্রেম-ভালোবাসাই না হলো তাহলে এ ধরনের বিবাহ কি কাজে আসবে ?

কুফু প্রসংগ

ইসলামী শরীয়ত স্বয়ং মুসলমানদের কাছেও এরূপ দাবি করে যে, সম্পর্ক সেই নারী ও পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হোক যাদের মধ্যে সার্বিক দিকের বিচারে প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ গড়ে ওঠার আশা করা যায়। যেখানে এরূপ আশা করা যায় না, সেখানে আত্মীয়তা করা 'মাকরূহ'। এ কারণেই নবী স. বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে নেয়ার আদেশ (অথবা অন্তত পরামর্শ) দিয়েছেন।

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ-

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহের পয়গাম পাঠায় তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নেয়া উচিত যে, তার মধ্যে এমন কোনো গুণ আছে কি না যা তাকে বিবাহ করার জন্য আকৃষ্ট করে।"

এজন্যই বিবাহের ব্যাপারে শরীয়ত 'কুফু'র বা সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা উত্তম মনে করে এবং অসম পর্যায়ের বিবাহকে উপযুক্ত মনে করে না। যে নারী ও পুরুষ নিজেদের নৈতিকতায়, ধর্মানুরাগে, পারিবারিক রীতি-নীতেতে, সামাজিক মর্যাদা ও জীবনযাত্রায় পরস্পর সমপর্যায়ের অথবা প্রায় কাছাকাছি—তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠার খুবই আশা করা যায়। তাদের পরস্পরের বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে এও আশা করা যেতে পারে যে, তাদের উভয়ের পরিবারও এ ধরনের আত্মীয়তার ফলে পরস্পর একাত্ম হতে থাকবে। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে এ সমতা বর্তমান নেই তাদের ব্যাপারে খুবই আশংকা রয়েছে যে, তাদের পারিবারিক জীবনে এবং আন্তরিক ও মানসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পর

একাত্ম হতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রী যদিও একাত্ম হয়ে যায় তবুও তাদের উভয়ের পরিবারের একাত্ম হয়ে যাওয়ার খুব কমই আশা করা যায়। ইসলামী শরীয়তে 'কুফু'র ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে মূল বিবেচ্য বিষয়।

উপরে উল্লিখিত উদাহরণ থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, নৈতিক নির্মলতা ও সতীত্ব সংরক্ষণের পর দ্বিতীয় বস্তু, যা ইসলামী দাম্পত্য বিধানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা। যে পর্যন্ত তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এগুলো বিদ্যমান থাকার আশা করা যায়, ইসলামী বিধান তাদের এ বৈবাহিক সম্পর্ককে যথাযথভাবে হেফাযত করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু যখন এ প্রেম ও ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে না এবং তার পরিবর্তে আন্তরিক শূন্যতা, পাষাণ মনোবৃত্তি, বিদ্বেষ, মনুষ্যত্বহীনতা, উপেক্ষা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, তখন দাম্পত্য বন্ধনকে খুলে ফেলার দিকেই আইন ঝুঁকে পড়ে। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কেননা যারা এ সূক্ষ্ম বিষয়টিকে উপেক্ষা করে ইসলামী আইনের মূলনীতিগুলোতে এর অংশ ও শাখা-প্রশাখা স্থাপন করে তারা পদে পদে এত মারাত্মক ত্রুটি করে যে, এতে আইনের মূল উদ্দেশ্যই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

❒

আইনের মূলনীতি ঃ প্রথম মূলনীতি

আইনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার পর আমাদের দেখতে হবে, ইসলামী দাম্পত্য বিধান কোন্ সব মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। কেননা যতক্ষণ মূলনীতিগুলো যথাযথভাবে জানা না যাবে ততক্ষণ ছোটখাট ব্যাপারে আইনের নির্দেশাবলী সঠিক পন্থায় প্রয়োগ করা কষ্টকর হবে।

আইনের মূলনীতিগুলোর মধ্যে প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, দাম্পত্য জীবনে পুরুষকে নারীর চেয়ে একধাপ বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এখান থেকে আইনের অনেক ধারা-উপধারা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - البقرة : ٢٢٨

"অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের ওপর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

এ অধিক মর্যাদার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে নীচের আয়াতে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ.

"পুরুষরা নারীদের পরিচালক। কেননা আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ নিজের ধন-মাল ব্যয় করে। সুতরাং সতী নারী তার স্বামীর অনুরক্ত হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানে আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণকারিণী হয়ে থাকে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এখানে এ আলোচনার অবকাশ নেই যে, পুরুষকে কিসের ভিত্তিতে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং কেনই বা তাকে কর্তা বানানো হয়েছে ?[৭] কারণ এটা আইনের আলোচ্য বিষয় নয় ; বরং সমাজ দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অতএব আমরা এখানে বিষয়বস্তুর গণ্ডির ভেতর থেকে এ কথার ব্যাখ্যা দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি যে, পারিবারিক জীবনের শৃংখলা বজায় রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের পরিচালক বা কর্তা হওয়া

---

৭. قَوَّامُ 'কাওয়াম' (Sustainer, Provider) কর্তা, রক্ষক, (Protector), অভিভাবক, পরিচালক।–গ্রন্থকার

অপরিহার্য। কিন্তু উভয়েই যদি সমমর্যাদার এবং সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হয়, তাহলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে বাধ্য। যেসব জাতি কার্যত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান করার চেষ্টা করেছে সেসব জাতির মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে এ বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলাম একটি স্বভাবসম্মত ধর্ম। কেননা তা মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে একজনকে কর্তা ও পরিচালক এবং অপরজনকে তার অধীনস্থ বানানো প্রয়োজন মনে করছে এবং কর্তৃত্বের জন্য সেই সম্প্রদায়কে নির্বাচন করেছে, যারা প্রকৃতিগতভাবে এ যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে।[৮]

পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী আইনের অধীনে দাম্পত্য জীবনের যে নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে পুরুষকে একজন কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এ মর্যাদার কারণেই তার ওপর নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ অর্পিত হয়েছে ঃ

১. মোহরানা ঃ স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করবে। কেননা স্বামী হিসাবে স্ত্রীর ওপর তার যে অধিকার সৃষ্টি হয়েছে তা মোহরানার বিনিময়েই। ওপরে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এ ব্যাখ্যাও মওজুদ রয়েছে যে, যদিও পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই কর্তৃত্বের অধিকারী, কিন্তু কার্যত তার এ মর্যাদা মোহরানার আকারে ব্যয়িত অর্থের বিনিময়েই অর্জিত হয়ে থাকে। অন্য আয়াতেও এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط - النساء : ٤

"এবং তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে আদায় করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ط - النساء : ٢٤

"এ মুহরিম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্য সব নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাঙ্ক্ষা করো। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌনচর্চা প্রতিরোধের জন্য এ ব্যবস্থা

৮. এ বিষয়বস্তুর ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমার লেখা 'পর্দা' বইটি দেখুন।–গ্রন্থকার

করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করছো তার চুক্তি অনুযায়ী তাদের মোহরানা পরিশোধ করো।"
–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - النساء : ٢٥

"অতএব তোমরা দাসীদেরকে তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করো এবং তাদের ন্যায়সংগত মোহরানা আদায় করো।"–সূরা নিসা ঃ ২৫

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

"এবং মোহরানা আদায়ের বিনিময়ে তোমাদের জন্য সম্ভ্রান্ত ঈমানদার নারী এবং যাদের কাছে তোমাদের পূর্বে কিতাব পাঠানো হয়েছে (অর্থাৎ আহলে কিতাব) তাদের মধ্যকার সতী নারী হালাল করা হয়েছে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫

সুতরাং বিবাহের সময় নারী ও পুরুষের মধ্যে মোহরানার যে চুক্তি হয়ে থাকে তা পরিশোধ করা পুরুষের অপরিহার্য কর্তব্য। সে যদি চুক্তি মোতাবেক মোহরানা আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজে কে আলাদা রাখার অধিকার রাখে। পুরুষের ওপর এটা এমনই এক দায়িত্ব যা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নেই। তবে স্ত্রী যদি তাকে সময় দেয় অথবা তার দারিদ্র্যের কথা বিবেচনা করে সন্তুষ্ট মনে মাফ করে দেয় অথবা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে খুশীর সাথে নিজের দাবি প্রত্যাহার করে নেয় তবে ভিন্ন কথা।

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا - النساء : ٤

"যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে নিজেদের মোহরানার অংশবিশেষ মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা তৃপ্তির সাথে ভোগ করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ط - النساء : ٢٤

"মোহরানার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণে কমবেশী করে নাও, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

২. স্ত্রীর খোরপোষ ঃ স্বামীর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। ইসলামী আইন-বিধান স্বামী-স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রের সীমা

পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে ঘরে অবস্থান করা এবং পারিবারিক জিন্দেগীর দায়িত্বসমূহ আনজাম দেয়া। وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ - الاحزاب : ٣٣ আর পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে আয়-উপার্জন করা এবং পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা। এ দ্বিতীয় বিষয়টির ভিত্তিতেই স্বামীকে স্ত্রীর ওপর এক ধাপ বেশী শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং এটা 'কর্তৃত্বে'র সঠিক অর্থের অন্তরভুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং খোঁজ-খবর রাখে তাকে 'কাওয়াম' বলা হয়। এ অধিকারবলেই সে ঐ বস্তুর ওপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা রাখে। কুরআন মজীদের আয়াত اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ এবং وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ থেকে যেরূপ মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে, অনুরূপভাবে খোরপোষের ব্যবস্থা করাও ওয়াজিব প্রমাণিত হচ্ছে। স্বামী যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে আইন তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করবে। সে যদি তা অস্বীকার করে অথবা অসমর্থ হয় তাহলে আইন তাদের বিবাহ ভেংগে দিতে পারে। কিন্তু খোরাকী দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ স্ত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা স্বামীর সামর্থ্যের ওপরেই নির্ভরশীল। কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি বলে দিয়েছে ঃ

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ج - البقرة : ٢٣٦

"ধনী ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।"
—সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬

কিন্তু এমন হতে পারে না যে, গরীবের কাছ থেকে আদায় করা হবে তার সাধ্যাতীত পরিমাণ এবং ধনীর কাছ থেকে আদায় করা হবে তার সামর্থ্যের তুলনায় কম পরিমাণ।

৩. যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকা ঃ পুরুষের তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীর ওপর তাকে যে অগ্রাধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে সে তার অপব্যবহার করতে পারবে না। অন্যায় আচরণের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন ঃ

'ঈলা' ঃ কোনো ন্যায়সংগত কারণ ছাড়াই[১] স্ত্রীকে শুধু শাস্তি ও যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করা থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে 'ঈলা'। এর জন্য ইসলামী বিধান সর্বোচ্চ চার মাসের সময়সীমা বেঁধে

১. 'ন্যায়সংগত কারণ' হচ্ছে, স্বামী অথবা স্ত্রীর রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা স্বামীর সফরে থাকা অথবা এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যে, স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা রাখে কিন্তু তার কাছে যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে না।—গ্রন্থকার

দিয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে এ সময়ের মধ্যে সে তার স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করে নিবে। অন্যথায় এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَاءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার শপথ করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সংকল্প করে, তাহলে আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৬-২২৭

এ মাসয়ালায় কোনো কোনো ফিক্‌হবিদ হলফ বা শপথের শর্ত আরোপ করেছেন। অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ করে তাহলেই 'ঈলা' হবে এবং তখনই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু কোনোরূপ শপথ ছাড়াই স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামী যদি দশ বছরও স্ত্রী থেকে আলাদা থাকে এমতাবস্থায় তার ওপর ঈলার হুকুম প্রযোজ্য হবে না। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। এ প্রসংগে আমার দলীল নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

এক ঃ যদি কুরআন মজীদ কোনো বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রে কোনো নির্দেশ দেয় এবং এমন ধরনের শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে যা শুধু সেই বিশেষ অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহলে এ নির্দেশ কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উদাহরণস্বরূপ কুরআন মজীদ সৎ কন্যাকে তার (সৎ) পিতার ওপর হারাম করার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করেছে তা হচ্ছে ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ - النساء : ٢٣

"তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের ক্রোড়ে পালিত হয়েছে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ২৩

যেসব মেয়ে শৈশবে তাদের মায়ের সাথে সৎ পিতার ঘরে এসেছে এ বাক্যে কেবল তাদের হারাম হওয়ার নির্দেশই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এমন কথা কোনো ইমামই বলেননি যে, এ নির্দেশ কেবল উল্লিখিত অবস্থার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। বরং যে মেয়ে তার সৎ পিতার সাথে মায়ের বিয়ের সময় যুবতী ছিল এবং এক দিনের জন্যও তাঁর এ পিতার ঘরে লালিত-

পালিত হয়নি—তার হারাম হওয়ার ব্যাপারেও সব ইমাম একমত। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ যদিও يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ (যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার শপথ করে) বাক্য ব্যবহার করেছে তবুও এসব ব্যক্তির জন্য যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা কেবল শপথকারী লোকদের ওপরই প্রযোজ্য হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

দুই ঃ ফিক্‌হী নির্দেশ বের (ইস্তিম্বাত) করার ব্যাপারে এ মূলনীতি সংক্রান্ত প্রায় সব ইমামই একমত যে, যদি কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া যায়, তাহলে এ ব্যাপারটি এমন কোনো ঘটনার ওপর অনুমান (কিয়াস) করা যেতে পারে, যে সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। তবে শর্ত হচ্ছে—উভয় ক্ষেত্রের এ নির্দেশের কারণসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা ঈলা করে তাদের জন্য আইনপ্রণেতা (আল্লাহ) সময়সীমা কেন নির্ধারণ করেছেন ? আর কেনই বা একথা বলেছেন, যদি সয়মসীমার মধ্যে (স্ত্রীর দিকে) প্রত্যাবর্তন না করো তাহলে তাকে তালাক দাও ? এর কারণ কি এছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে যে, চার মাসের অধিক কাল স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর এবং বিধানদাতা এ ক্ষতিরই প্রতিরোধ করতে চান ? এ আয়াতের পরবর্তী রুকূ'তে আল্লাহর এ নির্দেশ মওজুদ রয়েছে ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا - البقرة : ٢٣١

"তোমরা তাদেরকে শুধু পীড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে আটকিয়ে রেখো না, যেন তাদের প্রতি তোমরা অবিচার না করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১

এবং সূরা আন নিসার মধ্যে শরীয়ত প্রদানকারী বলেন ঃ

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط - النساء : ١٢٩

"অতএব তোমরা এক স্ত্রীর প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না যদ্দরুন অন্য স্ত্রীরা ঝুলন্ত প্রায় হয়ে পড়ে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

এসব ইংগিত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধনেও আবদ্ধ রাখা আবার তাকে দোদুল্যমান অবস্থায় সম্পর্কচ্যুত করে রাখা এবং শুধু যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ করে রাখা, এসব কিছু শরীয়ত প্রণেতা আদৌ পসন্দ করেন না। চার মাসের মুদ্দত নির্ধারণ করার কারণ এছাড়া আর কিছু বর্ণনা করা যেতে পারে না। এখন যদি উক্ত কারণ এ অবস্থার মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া যায়, যখন স্বামী কোনোরূপ শপথ ছাড়াই ইচ্ছাপূর্বক নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস পরিত্যাগ করে—তাহলে কেন উল্লিখিত নির্দেশ এ

ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না? শপথ করা আর না করা শেষ পর্যন্ত মূল বিষয় 'ক্ষতি গ্রস্ত হওয়া'র মধ্যে এমন কি পার্থক্য সৃষ্টি করে? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এটা কল্পনা করতে পারেন যে, স্বামী শপথ করে সহবাস ত্যাগ করলেই স্ত্রীর ক্ষতি হবে, আর সে যদি শপথ না করে সারা জীবনও স্ত্রীর কাছে না যায়, তাহলে তার ক্ষতি হবে না?

তিন ঃ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে দাম্পত্য বিধানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র ও সতীত্বের হেফাযত করা। স্বামী যদি এক স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে তাহলে সে সহজেই নিজেকে কুকর্ম ও কুদৃষ্টি থেকে হেফাযত করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু সে যে স্ত্রীকে সহবাসের সুখ থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে সে তার কাছে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত এ স্ত্রী কিভাবে নিজের সতীত্ব ও চরিত্রের হেফাযত করতে সক্ষম হবে? আইনদাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহর কাছে এটা কি আশা করা যায় যে, এরূপ স্ত্রীর স্বামী যদি তার কাছ থেকে দূরে থাকার শপথ করে থাকে তাহলে তার চরিত্রের হেফাযতের ব্যবস্থা তিনি করবেন অথবা তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চরিত্র কলংকিত হওয়ার আশংকায় ফেলে রাখবেন?

এসব কারণে আমার মতে মালিকী মাযহাবের ফিক্হবিদগণের অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া হওয়া উচিত। তাঁরা বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সহবাস বর্জন করে তাহলে তার ওপরও 'ঈলা'র হুকুম প্রযোজ্য হবে, যদিও সে শপথ করেনি। কেননা ঈলার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার ক্ষেত্রে আইনদাতার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্ষতি রোধ করা। যেখানে শপথ ছাড়াই ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্যে সহবাস বর্জন করা হয়েছে সেখানেও এ কারণ (ইল্লাত) পাওয়া যাচ্ছে।[১০]

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়েও ফকীহদের মতানৈক্য রয়েছে। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান, যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর রায় হচ্ছে, চার মাসের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়াই প্রমাণ করে যে, স্বামী তালাক দেয়ার সংকল্প করেছে। অতএব এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'রুজু' অর্থাৎ তার পুনঃগ্রহণের অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। হযরত আলী ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও এই মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত দুজনের অপর এক বর্ণনা ও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু

---

১০. ইবনুল আরাবীর 'আহকামুল কুরআন', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৫ এবং ইবনে রুশদের 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮।—গ্রন্থকার

আনহার বর্ণনায় রয়েছে যে, মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বামীকে এই মর্মে নোটিশ দিতে হবে—হয় নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নাও অন্যথায় তাকে তালাক দাও। কিন্তু আমরা যখন আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করি তখন প্রথম মতটিই সঠিক মনে হয়। আয়াতে 'ঈলাকারী'কে আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট শব্দে মাত্র চার মাসের সময় বেঁধে দিয়েছেন। তার পুনঃগ্রহণের অধিকারও এ সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[১১] সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তালাক (পৃথক হয়ে যাওয়া) ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এখন যদি কোনো ব্যক্তিকে চার মাসের পর তাকে পুনঃগ্রহণের অধিকার দেয়া হয় তাহলে সে যেন অবকাশের সময়সীমাকে আরও বৃদ্ধি করলো। এ বৃদ্ধি প্রকাশ্যত আল্লাহ্ তাআলার কিতাবের নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত।

ক্ষতিসাধন ও সীমালংঘন

স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ না থাকলে তাকে রেখো না। কিন্তু শুধু নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাকে আটকে রাখা, বারবার তালাক দেয়া, দুই তালাক দেয়ার পর তৃতীয় তালাকের পূর্বে পুনঃগ্রহণ করা, এরূপ আচরণ করতে কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটা হচ্ছে যুলুম।

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا - البقرة : ٢٣١

"এবং তোমরা তাদেরকে নির্যাতন ও অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। যে ব্যক্তি এমন করবে সে নিজের উপর অত্যাচার করবে। সাবধান! আল্লাহর আয়াতসমূহকে তামাশার বস্তু বানিও না।"[১২]

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১

'দিরার' (ক্ষতিসাধন) ও 'তাআদ্দী' (সীমালংঘন) শব্দদ্বয় ব্যাপক অর্থবোধক। এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করার

---

১১. এ ক্ষেত্রে তালাক কি এক তালাক বায়েনের পর্যায়ে পড়বে নাকি এক তালাকে রিজঈর পর্যায়ে পড়বে–তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।–গ্রন্থকার

১২. আইনের শব্দগুলো থেকে এমন অবৈধ ও নাজায়েয ফায়দা হাসিল করা যা আইনের উদ্দেশ্য ও স্পীরিটের বিপরীত—মূলত তা হচ্ছে আইনের সাথে তামাশা করারই নামান্তর। কুরআনে পুরুষদের অধিকার দেয়া হয়েছে যে, এক তালাক অথবা দুই তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করো ; তাও কেবল এ উদ্দেশ্যেই যে, এ সময়ের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটা সমঝোতা হয়ে যায় এবং পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করার কোনো রকমের উপায় বের হয়ে আসে তাহলে শরীয়তের পক্ষ থেকে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা তাদের পথরোধ

উদ্দেশ্যে কোনো স্ত্রীকে আটকে রাখবে, সে তাকে সবরকম পন্থায়ই নির্যাতন করবে। তাকে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিবে। ইতর প্রকৃতির লোক হলে মারধর ও গালিগালাজ করবে, উচ্চ শ্রেণীর লোক হলে নির্যাতন ও হেয়প্রতিপন্ন করার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবে। ক্ষতিসাধন ও সীমা লংঘনের শব্দগুলোর মধ্যে এর সব ধরনের পদ্ধতিই অন্তরভুক্ত রয়েছে এবং কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের সব পন্থাই নিষিদ্ধ। যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এ ধরনের আচরণ করে তবে সে বৈধ সীমালংঘনকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর অধিকার রয়েছে যে, সে আইনের সাহায্য নিয়ে এ ব্যক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ না করা

একাধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোনো একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে ঝুলিয়ে রাখা অন্যায়। কুরআন মজীদ পরিষ্কার ভাষায় এটাকে নাজায়েয বলেছে ঃ

فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلاَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط - النساء : ١٢٩

"তোমরা কোনো এক স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে পড়ো না যদ্দরুন অন্যান্য স্ত্রী ঝুলন্ত প্রায় হয়ে পড়ে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

কুরআন মজীদে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি আদল ও ইনসাফের শর্তেই দেয়া হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি ইনসাফ না করে, তাহলে এ শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি থেকে ফায়দা ওঠানোর অধিকার তার নেই। স্বয়ং যে আয়াতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাতেও পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে অক্ষম হও তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো।

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ط - النساء : ٣

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

করে না দাঁড়ায়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এ সুযোগ থেকে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে স্ত্রীকে তালাক দিল, অতপর ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে 'রুজু' করে নিল এবং সে পুনরায় তালাক দিল, আবার পূর্বের মত 'রুজু' করলো, তার এরূপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অযথা স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা। সে তাকে নিজের ঘরেও রাখে না আবার মুক্তও করে দেয় না যে, বেচারী অন্য কোথাও বিবাহ করে নিবে। সুতরাং এরূপ আচরণ আল্লাহর আইনের সাথে প্রহসন বৈ কিছুই নয়। কোনো সাচ্চা মু'মিন ব্যক্তি এরূপ করার সাহস করতে পারে না।
–গ্রন্থকার

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে এক স্ত্রীই গ্রহণ করো অথবা যেসব দাসী তোমাদের মালিকানাধীন রয়েছে, তাদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করো। অবিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটাই হচ্ছে অধিকতর সঠিক কাজ।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি اَلاَّ تَعُوْلُوْا -এর অর্থ করেছেন, 'যেন তোমাদের সন্তান অধিক না হয়, যাদের লালন-পালনের ভার তোমাদের ওপর ন্যস্ত হয়ে পড়বে।' কিন্তু এ অর্থ মূল অভিধানের বিপরীত। অভিধানে مول -এর অর্থ হচ্ছে 'ঝুঁকে যাওয়া'। আবু তালিবের কবিতা ঃ

بِمِيْزَانِ صِدْقٍ لاَ يَخِسُّ شَعِيْرَةً - وَوَازَّانُ قِسْطٍ وَزْنَهُ غَيْرَ عَائِلْ -

এখানে عائل (আয়েল) ঝুঁকে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে عاول (আওল) শব্দটি অন্যায়-অত্যাচার ও ইনসাফের পথ থেকে সরে যাওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অতএব ইবনে আব্বাস রা., হাসান, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরিমা ও কাতাদা র. প্রমুখ لاَ تَعُوْلُوْا -এর অর্থ করেছেন لا تَمِيْلُ عَنِ الْحَقِّ (ন্যায় থেকে সরে পড়ো না)। অতএব কুরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি দুই অথবা ততোধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ করে না এবং এক স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে অন্যদের অধিকার আদায় করার ব্যাপারে ত্রুটি করে সে যালেম। সুতরাং 'একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি' দ্বারা তার উপকৃত হওয়ার কোনো অধিকার নেই। এমতাবস্থায় আইনত তাকে একজনমাত্র স্ত্রী রাখার জন্য বাধ্য করা উচিত এবং অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীদের এ অধিকারও থাকা উচিত যেন তারা এ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে প্রতিকার লাভ করতে পারে।

আদল ও ইনসাফের ক্ষেত্রে কুরআন মজীদ বিশদ ব্যাখ্যা করে দিয়েছে যে, আন্তরিক ভালোবাসার ক্ষেত্রে যতদূর সম্পর্ক রয়েছে, তাতে সমতা রক্ষা করা না মানুষের পক্ষে সম্ভব, আর না সে শরীয়তের দৃষ্টিতে দায় বহনকারী।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ - النساء : ١٢٩

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

অবশ্য যে ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে, ভরণ-পোষণ, সদাচরণ এবং স্বামী-স্ত্রী সুলভ জীবনযাপনে সকলের সাথে সমান ব্যবহার।

পুরুষের এ তিন প্রকারের অন্যায় আচরণে আইন হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন অনেক ব্যাপারও আসতে পারে এবং আসছেও যা প্রেম ও ভালোবাসার পরিপন্থী। কিন্তু সেখানে আইনের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। কুরআন মজীদ এসব ব্যাপারে স্বামীদের সাধারণ নৈতিক উপদেশ প্রদান করেছে। এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে, স্ত্রীর সাথে স্বামীর আচরণ উদার ও প্রেমময় হওয়া বাঞ্ছনীয়। দিন-রাত ঝগড়াঝাটি আর কেলেংকারীর মাঝে জীবনযাপন করা আহাম্মকী ছাড়া আর কিছু নয়। যদি স্ত্রীকে রাখতে হয় তাহলে সরলভাবেই রাখো, বনিবনা না হলে ভালোয় ভালোয় বিদায় করে দাও। কুরআনের এ উপদেশগুলো শক্তি ও ক্ষমতাবলে কার্যকর করা সম্ভব নয়। আর এও সম্ভব নয় যে, স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো বিবাদে আইন হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু এসব কিছু থেকে আইনের স্পীরিট এটাই মনে হয় যে, তা ন্যায়-ইনসাফ, আন্তরিকতা ও ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহারের দায়িত্ব বেশীর ভাগই স্বামীর ওপর ন্যস্ত করে।

পুরুষের অধিকারসমূহ

যেসব দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতে পুরুষকে কর্তৃত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে ওপরে তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দেখা যাক কর্তা হওয়ার কারণে পুরুষের কি কি অধিকার রয়েছে ঃ

১. গোপনীয় বিষয়সমূহের হেফাযত করা ঃ নারীর ওপর পুরুষের প্রথম অধিকারকে কুরআন মজীদ এমন শব্দে বর্ণনা করেছে যার বিকল্প অন্য কোনো ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কুরআন বলে ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط - النساء : ٣٤

"সুতরাং সতী নারীরা তাদের স্বামীদের অনুরক্ত হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানে আল্লাহর অনুগ্রহে তার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণকারিণী হয়ে থাকে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এখানে حفظ للغيب বাক্যাংশ দ্বারা স্বামীর যাবতীয় জিনিস যা তার অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর কাছে আমানত হিসাবে রক্ষিত থাকে তার হেফাযত করা বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে তার বংশের, তার বীর্যের, তার ইজ্জত-আব্রুর, তার ধন-সম্পদের হেফাযত, মোটকথা এর মধ্যে সবকিছুই এসে যায়। যদি স্ত্রী উপরোল্লেখিত অধিকারসমূহ থেকে কোনো একটি অধিকার পূর্ণ করতেও ক্রুটি করে তাহলে স্বামী সামনের আলোচনায় উল্লিখিত তার ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবে।

২. স্বামীর আনুগত্য ঃ স্বামীর দ্বিতীয় অধিকার হচ্ছে, স্ত্রী তার আনুগত্য করবে। فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ 'যারা নেক, সৎ ও চরিত্রসম্পন্না স্ত্রী তারা স্বামীর খেদমতগার হয়ে থাকে।'

এ হচ্ছে একটি সাধারণ নির্দেশ, যার ব্যাখ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন জিনিস বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

اِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ ـ

"তাদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে তোমাদের ঘরে আসতে দিবে না যাকে তোমরা আদৌ পসন্দ করো না।"

لاَ تَصَدَّقَ بِشَىْءٍ مِّنْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ فَاِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الاَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

"স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার ঘরের কোনো বস্তু সে দান-খয়রাত করবে না। সে যদি এরূপ করে তাহলে এর সওয়াব স্বামীই পাবে। কিন্তু স্ত্রীর হবে গুনাহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী বাড়ীর বাইরে যাবে না।"

لاَ تَصُوْمُ الْمَرْاَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ مِّنْ غَيْرِ رَمَضَانَ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

"স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রী তার অনুমতি ব্যতিরেকে রমযানের রোযা ছাড়া একদিনও নফল রোযা রাখবে না।"

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَاَةٌ اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَاِذَا اَمَرْتَهَا اَطَاعَتْكَ وَاِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِىْ مَالِكَ وَنَفْسِهَا ـ

"সর্বোত্তম স্ত্রী হচ্ছে, যখন তুমি তার দিকে তাকাও তখন তোমার অন্তর আনন্দিত হয়ে যায়, যখন তুমি তাকে কোনো আদেশ করো, সে তা পালন করে এবং যখন তুমি অনুপস্থিত থাকো, সে তোমার ধন-সম্পদ ও তার ওপর তোমার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে।"

আনুগত্যের এ সাধারণ আদেশের মধ্যে কেবল একটি জিনিসই ব্যতিক্রম, তা হচ্ছে স্বামী যদি স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানী করার নির্দেশ দেয় তাহলে এ আদেশ পালন করতে স্ত্রী অস্বীকার করতে পারে, বরং সে তা অস্বীকার করবে। যেমন সে যদি কোনো ফরয নামায পড়তে ও ফরয রোযা রাখতে নিষেধ করে বা মদ পানের আদেশ দেয় অথবা শরীয়ত নির্দেশিত পর্দা

বর্জন করতে বলে কিংবা তাকে দিয়ে গর্হিত কাজ করাতে চায়, তাহলে স্বামীর এ নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করা স্ত্রীর জন্য শুধু জায়েযই নয়, বরং ফরয। কেননা স্রষ্টার আইন লংঘিত হয়, এমন কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েয নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ -

"স্রষ্টার নাফরমানীমূলক কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

এ বিশেষ দিকগুলো ছাড়া অন্য সব অবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ফরয, তা না করলে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবে যার বর্ণনা সামনে আসছে।

পুরুষের ক্ষমতাসমূহ

ইসলামী আইন যেহেতু পুরুষকে কর্তা বা পরিচালক বানিয়েছে এবং তার ওপর স্ত্রীর মোহরানা, ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেহেতু তা পুরুষকে স্ত্রীর ওপর এমন কতকগুলো ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রদান করেছে, যা পারিবারিক জীবনের শৃংখলা বজায় রাখতে, পরিবারে সদস্যদের আমল-আখলাক, চাল-চলন ও সামাজিকতা সংরক্ষণে এবং নিজেদের অধিকারসমূহ বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তার হাতে থাকা প্রয়োজন। ইসলামী আইনে এসব এখতিয়ারের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং যে সীমার ভেতর এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে তাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

১. উপদেশ, সদাচরণ ও শাসন ঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর আনুগত্য না করে অথবা তার অধিকার খর্ব করে, তাহলে এ অবস্থায় স্বামীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাকে উপদেশ দেয়া। সে তা অমান্য করলে স্বামী তার ব্যবহারের প্রয়োগফল অনুযায়ী কঠোরতা অবলম্বন করবে। এরপরও যদি সে তা মান্য না করে তাহলে তাকে হালকা মারধরও করতে পারে।

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط -

"আর তোমরা যে সমস্ত নারীর অবাধ্য[১৩] হওয়ার আশংকা করো, তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাকো এবং

১৩. 'নুশূয' শব্দের অর্থ উচ্চতা, উত্থান। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে অধিকার আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন—চাই তা স্বামীর পক্ষ থেকে হোক অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে।–গ্রন্থকার

প্রহার করো। অতপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের ওপর নির্যাতন চালাবার অজুহাত তালাশ করো না।"

–সূরা আন নিসা : ৩৪

এ আয়াতে وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ 'বিছানায় তাদের ছেড়ে দাও' বলে শাস্তিস্বরূপ সহবাস বর্জন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'ঈলা'র আয়াত পৃথক বিছানায় রাখার জন্য একটি স্বাভাবিক সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ মুদ্দত চার মাস। যে স্ত্রী এতটা অবাধ্য ও উদ্ধত মস্তিষ্ক যে, স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে তার সাথে শোয়া পরিত্যাগ করেছে এবং সে এও জানে যে, চার মাস পর্যন্ত এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকার পর আল্লাহ তাআলার নির্দেশানুযায়ী স্বামী তাকে তালাক দিবে, এরপরও সে নিজের অবাধ্যাচরণ থেকে বিরত হয় না, তাকে বর্জন করাই উপযুক্ত কাজ। চার মাসের সীমা আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। এর চেয়ে অধিক কাল পর্যন্ত শাস্তি দেয়া নিষ্প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত তার অবাধ্য আচরণের ওপর অবিচল থাকার পরিণাম হচ্ছে তালাক। এটা জানা সত্ত্বেও সংশোধন না হওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে আদব-কায়দা শেখার যোগ্যতাই নেই অথবা অন্তত এ স্বামীর সাথে সে সৌজন্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম নয়। অনন্তর যে উদ্দেশ্যে একজন পুরুষকে একজন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়—এ স্ত্রীর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশংকা আছে। এ অবস্থায় স্বামীর যৌনস্পৃহা পূরণ করার জন্য কোনো অবৈধ পথে ঝুঁকে পড়ারও আশংকা রয়েছে। স্ত্রীও কোনো নৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে পড়তে পারে এবং এও আশংকা আছে যে, যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে কেউ এতটা জেদী ও উদ্ধত সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি না হওয়ারই কথা।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী র. থেকে وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ আয়াতের অর্থ প্রসংগে একটি কথা বর্ণিত আছে। তিনি আরবের প্রচলিত প্রবাদকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলেছেন, 'হিজরুন' অর্থ বাঁধা। তারা বলে, هَجَرَ الْبَعِيْرَ اِذَا رَبَطَهُ صَاحِبُهُ بِالْهِجَارِ 'হিজরুন' সে রশিকে বলা হয়, যার দ্বারা উটের পিঠ ও টাঙ্গা একত্র করে বাঁধা হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বাণী হচ্ছে, যদি সে (স্ত্রী) উপদেশ গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে গৃহের মধ্যে বেঁধে (আবদ্ধ) রাখো। কিন্তু এ অর্থ কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে। فِى الْمَضَاجِعِ শব্দের মধ্যে কুরআন স্বীয় উদ্দেশ্যের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত করেছে। مَضْجَعِ শোয়ার জায়গাকে বলা হয়। অতএব শোয়ার 'জায়গা'র স্থলে 'বাঁধা' অর্থ সম্পূর্ণ নিরর্থক।

দ্বিতীয় শাস্তি, যার অনুমতি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে মারধোরের শাস্তি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, বেদম মার যেন না হয়।

وَاضْرِبُوْهُنَّ اِذَا عَصَيْنَكُمْ فِى الْمَعْرُوْفِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا يُضْرَبُ الْوَجْهُ وَلَا يُقَبَّحُ-

"যদি তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের কোনো ন্যায়সংগত আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাদেরকে এরূপ মারধোর করো যেন তা অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হয়। মুখাবয়বে আঘাত করা যাবে না এবং গালি-গালাজও করা যাবে না।"

এ দুই ধরনের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা পুরুষকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী অবাধ্যতা ন্যায্য অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট হলেই কেবল শাস্তি দেয়া যাবে। ন্যায়-অন্যায় প্রতিটি আদেশ মানার জন্য জোর-জবরদস্তি করা যাবে না এবং স্ত্রী তা অমান্য করলেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। তাছাড়া অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহের মধ্যে এও এক মূলনীতি ঃ

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ-

"যে কেউ তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করে তোমরাও তার সাথে অনুরূপ পরিমাণ বাড়াবাড়ি করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৪

বাড়াবাড়ির তুলনায় অধিক শাস্তি দেয়া হচ্ছে যুলুম। যে অপরাধের ক্ষেত্রে উপদেশই যথেষ্ট সেখানে কথাবার্তা বন্ধ রাখা যেখানে কথাবার্তা বন্ধ রাখাই যথেষ্ট সেখানে সহাবস্থান বর্জন করা এবং যে ক্ষেত্রে বিছানা পৃথক করে দেয়াই যথেষ্ট সেখানে মারধোর করা যুলুম পরিগণিত হবে। কেননা মারধোর হচ্ছে সর্বশেষ শাস্তি, যা কেবল মারাত্মক ও অসহনীয় অপরাধের জন্যই দেয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ সীমালংঘন করলে স্বামীর বাড়াবাড়ি হবে এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকারিণী হবে।

২. তালাক ঃ পুরুষকে দ্বিতীয় যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা হলো, যে স্ত্রীর সাথে সে মিলেমিশে বসবাস করতে পারবে না তাকে তালাক দিবে। যেহেতু পুরুষ তার নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করেই স্বামীত্বের অধিকার অর্জন

করে, সেহেতু সে সমস্ত অধিকার থেকে হাত গুটিয়ে নেয়ার ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়েছে।[১৪] নারীকে এ ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে না। কেননা যদি সে তালাক দেয়ার অধিকারী হতো তাহলে সে পুরুষের অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে নির্ভীক হয়ে যেত। এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয় করে কোনো জিনিস হাসিল করে, সে তা রক্ষা করার জন্য শেষ চেষ্টা করে যাবে এবং কেবল তখনই তা ত্যাগ করবে যখন তা বর্জন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু যদি অর্থ ব্যয় করে এক পক্ষ এবং তাদ্বারা হাসিল করা বস্তু ধ্বংস করার ক্ষমতা অপর পক্ষের জুটে যায়, তাহলে এ দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে এটা কমই আশা করা যায় যে, সে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার বেলায় অর্থ ব্যয়কারী প্রথম পক্ষের লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। সুতরাং পুরুষের হাতে তালাক প্রদান করা শুধু তার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করাই নয়, বরং এর ভেতর আর একটি বিচক্ষণতা নিহিত রয়েছে যে, এতে তালাকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হবে না।

---

১৪. একদল লোক পাশ্চাত্যের অনুকরণে এটা চাচ্ছে যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আদালতকে দেয়া হোক। যেমন তুরস্কে এরূপ করা হয়েছে। কিন্তু এটা চূড়ান্তরূপে কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী। কুরআন তালাকের আহকাম বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিটি স্থানে তালাকের ক্রিয়াকে স্বামীর দিকে নির্দেশ করেছে ঃ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ - فَاِنْ طَلَّقَهَا - وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ - ইত্যাদি। এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা কেবল স্বামীকে দেয়া হয়েছে। আবার কুরআন পরিষ্কার ভাষায় স্বামীর সম্বন্ধে বলে بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ "বিবাহের বন্ধন তার (স্বামীর) হাতে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

এখন কার এ অধিকার আছে যে, এ বন্ধনকে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিচারকের হাতে তুলে দিবে ? ইবনে মাজা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো, "আমার মালিক তার এক দাসীকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছিল। এখন সে তাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।" এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ স. তার ভাষণে বললেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ اَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُمَا - اِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ -

"হে লোকেরা ! এ কেমন অদ্ভুত কথা যে, তোমাদের কেউ নিজের দাসীকে স্বীয় দাসের সাথে বিবাহ দেয়, আবার উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় ? অথচ তালাকের ক্ষমতা কেবল স্বামীদেরই।"

এ হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে মযবুত নয়, কিন্তু কুরআনের নির্দেশের সাথে এর সামঞ্জস্য একে শক্তিশালী করেছে। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী অনুযায়ী তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিচারালয়ের হাতে তুলে দেয়া কখনো জায়েয নয়। যুক্তির দিক থেকেও তা হচ্ছে ভ্রান্ত পদক্ষেপ। এর পরিণাম এছাড়া আর কি হতে পারে যে, ইউরোপের মত আমাদের এখানেও পারিবারিক জীবনের লজ্জাকর বিবাদসমূহ ও অশোভনীয় ঘটনাবলী প্রকাশ্য আদালতের সামনে প্রচারিত হতে থাকবে ?–গ্রন্থকার

দ্বিতীয় মূলনীতি

ইসলামের দাম্পত্য আইনের দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, বৈবাহিক সম্পর্ককে যথাসাধ্য সুদৃঢ় করা এবং যে পুরুষ ও নারী একবার আত্মীয়তার এ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে তাদের পরস্পরকে একত্রে গ্রথিত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। কিন্তু যখন তাদের মাঝে ভালোবাসা ও মিলমিশের কোনো উপায়ই আর অবশিষ্ট থাকে না এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকায় আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন তাদের ঘৃণা-বিদ্বেষ ও আন্তরিক গরমিল থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের সাথে একত্র হয়ে থাকার জন্য জোরাজুরি করা উচিত নয়। এমতাবস্থায় তাদের বিচ্ছেদের পথ খুলে দেয়াই হবে তাদের ও সমাজের জন্য কল্যাণকর। এ ব্যাপারে ইসলামী আইন মানব স্বভাবের প্রবণতা এবং সামাজিক শৃংখলা ও অখণ্ডতা রক্ষার মধ্যে এমন সঠিক ভারসাম্য স্থাপন করেছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো আইন-বিধানেই পাওয়া যাবে না। একদিকে তা বৈবাহিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে চায়। কিন্তু তা হিন্দু ও খৃস্ট ধর্মের মত নয়। এ দুই ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বৈবাহিক জীবনটা যত যন্ত্রণাদায়কই হোক না কেন, কোনো অবস্থায়ই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। অপর দিকে ইসলামী আইন বিচ্ছেদের পথ খুলে দেয়। কিন্তু তাও রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশের মত এত সহজে নয়। এসব দেশে বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো স্থায়িত্ব মোটেই অবশিষ্ট নেই। সেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের দুর্বলতার ফলে পারিবারিক জীবনের সমস্ত শৃংখলা ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে।

এ মূলনীতির অধীনে বিচ্ছেদের যে সমস্ত পন্থা রাখা হয়েছে তার সংখ্যা তিন ঃ তালাক, খোলা ও বিচারকের ফায়সালা।

তালাক ও এর শর্তসমূহ

শরীয়তের পরিভাষায় 'তালাকে'র অর্থ হচ্ছে 'বিচ্ছেদ' যার অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। পুরুষ তার এ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সে যখনই চায় তার এ দাম্পত্য অধিকারসমূহ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারে, যা সে মোহরের বিনিময়ে অর্জন করেছে। কিন্তু শরীয়ত তালাক পসন্দ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الطَّلَاقُ -

"সমস্ত হালাল বস্তুর মধ্যে তালাকই হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত।"

تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ -

"বিবাহ করো কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা স্বাদ অন্বেষণকারী ও স্বাদ অন্বেষকারিণীদের পসন্দ করেন না।"

এজন্য পুরুষকে তালাকের স্বাধীন এখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে তাকে কতগুলো শর্তেরও অধীন করে দেয়া হয়েছে। সে এ শর্তের আওতাধীনে কেবল সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে তার এ ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারবে।

কুরআন মজীদের শিক্ষা হচ্ছে—স্ত্রী যদি তোমার অপসন্দীয়ও হয় তবুও যথাসাধ্য তার সাথে সদ্ভাবে মিলেমিশে জীবন যাপন করার চেষ্টা করো। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○ - النساء : ١٩

"তোমরা (স্বামীরা) তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। তারা (স্ত্রীরা) যদি তোমাদের মনের মতো না হয়, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো জিনিসকে অপসন্দ করো, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার মধ্যে অফুরন্ত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯

কিন্তু যদি মিলেমিশে না-ই থাকতে পারো তাহলে তোমার এ অধিকার আছে যে, তাকে তালাক দাও। কিন্তু এক কথায় বিদায় করে দেয়া জায়েয নয়। এক এক মাসের ব্যবধানে এক এক তালাক দাও। তৃতীয় মাসের শেষ নাগাদ তুমি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবে। হয়ত বা সমঝোতার কোনো উপায় বেরিয়ে আসবে অথবা স্ত্রীর আচরণের মধ্যে পসন্দনীয় কোনো পরিবর্তন এসে যেতে পারে কিংবা স্বয়ং তোমার অন্তরও পালটে যেতে পারে। অবশ্য এ সময়-সুযোগের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝাপড়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে যদি ত্যাগ করাই তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে তৃতীয় মাসে শেষ তালাক দাও অথবা পুনঃগ্রহণ (রুজু) না করে ইদ্দাত অতিবাহিত হতে দাও।[১৫]

---

১৫. সর্বোত্তম পন্থা এই যে, তৃতীয়বার তালাক না দিয়ে এমনিতেই ইদ্দাতের সময় অতিবাহিত হতে দেয়া। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে পুনর্বার বিবাহ হওয়ার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে তা 'মুগাল্লাযা' বা চূড়ান্ত তালাকে পরিণত হয়।

(পরের পৃষ্ঠায়)

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط - البقرة : ٢٢٩

"তালাক হচ্ছে দুবার। অতপর হয় উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখতে হবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দিতে হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ... وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ط - البقرة : ٢٢٨

"যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা তিনবার মাসিক ঋতু আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে (পুনর্বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। ... তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হয় তাহলে তারা এ অবকাশের মধ্যে তাদেরকে নিজেদের স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

এর সাথে সাথে এ নির্দেশও রয়েছে যে, তিন মাসের এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিও না, বরং নিজের কাছেই রাখো। আশা করা যায় সহঅবস্থানের ফলে পুনরায় আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের কোনো উপায় বের হয়ে যাবে।

اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ج وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ - الطلاق : ١-٢

"তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, তাদেরকে তাদের ইদ্দাতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের সুযোগ রেখেই তালাক দাও। ইদ্দাতের সময় গুণতে থাকো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা (ইদ্দাত চলাকালে) তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বের হয়ে

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর)
এরপর তাহলীল ছাড়া প্রাক্তন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিবাহ হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লোকেরা সাধারণত এ মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং যখন তালাক দিতে উদ্যত হয়, একত্রে তিন তালাক ছুঁড়ে মারে। পরে অনুতপ্ত হয় এবং মুফতীদের কাছে গিয়ে ছল-চাতুরী করে বেড়ায়।–গ্রন্থকার

যাবে না। তবে তোমরা কেবল তখনই তা করতে পারো যখন তারা প্রকাশ্যে কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে সে নিজের ওপর অত্যাচার করে। তুমি জানো না, হয়ত বা এরপর আল্লাহ সমঝোতার কোনো একটা অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। অতপর যখন তারা ইদ্দাতের নির্দিষ্ট সময়ের সমাপ্তিতে পৌঁছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালোভাবে ফিরিয়ে রাখো অথবা উত্তম পন্থায় তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।"-সূরা আত তালাক ঃ ১-২

তাছাড়া মাসিক ঋতু (হায়েয) অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তালাক দিতেই হয় তাহলে তুহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দাও। এর দুটি কারণ রয়েছে ঃ

এক ঃ হায়েয অবস্থায় নারীরা সাধারণত খিটখিটে মেযাজ ও চঞ্চলমতি হয়ে যায়। এ সময় তাদের শারীরিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে যে, তাদের থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন সব কথাবার্তা প্রকাশ পায়, যা তারা নিজেরাও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ করা পসন্দ করে না। এ হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক নিগূঢ় তত্ত্ব। এজন্য হায়েয অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে বিবাদ ঘটে তার ভিত্তিতে তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

দুই ঃ এ সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকে না, যা তাদের পারস্পরিক চিত্তাকর্ষণ ও প্রেম-ভালোবাসার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সময় উভয়ের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এ প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাওয়ার পর আশা করা যায়, যৌন আকর্ষণ পুনরায় স্বামী-স্ত্রীকে দুধ-চিনির মতো পরস্পর মিলিয়ে দিবে এবং যে মলিনতা স্বামীকে তালাক দেয়ার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল তা দূর হয়ে যাবে।

এসব কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়েয অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত উমর রা. এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি তা শুনে খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ তাকে আদেশ করো সে যেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং যখন সে মাসিক ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন তালাক দেবে। অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে উমরকে তাঁর এ কাজের জন্য তিরস্কার করেছেন এবং তালাক দেয়ার নিয়ম এভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

ইবনে উমর! তুমি ভুল পন্থা অবলম্বন করেছ। সঠিক পন্থা এই যে, তুমি তুহরের অপেক্ষা করো। অতপর প্রতি তুহরে এক তালাক দাও। অতপর সে যখন (তৃতীয়বার) পাক হবে তখন হয় তাকে তালাক দাও অথবা ফিরিয়ে রাখো। ইবনে উমর রা. বললেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلٰثًا كَانَ لِىْ اَنْ اُرَاجِعُهَا ـ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাকে একত্রে তিন তালাক দিতাম তাহলেও কি আমার রুজু করার অধিকার বাকি থাকতো?"

রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ

لاَ كَانَتْ تَبِيْنُ وَتَكُوْنُ مَعْصِيَةً ـ

"না, সে আলাদা হয়ে যেত এবং এটা গুনাহের কাজ হতো।"

এ থেকে আরো একটি কথা জানা গেলো, তা হচ্ছে—একই সময়ে তিন তালাক দেয়া মস্তবড় গুনাহ। এরূপ কাজ মূলত ইসলামী শরীয়তের সতর্ক নীতির পরিপন্থী। এতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হয়, যার মর্যাদা দেয়ার জন্য সূরা তালাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১৬]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে কোনো ব্যক্তি একই বৈঠকে তিন তালাক দিয়ে তাঁর কাছে আসতো, তিনি তাকে দৈহিক শাস্তি দিতেন এবং স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি একই সময় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, এর হুকুম কি? তিনি বললেন ঃ

اِنَّهُ قَدْ عَصٰى رَبَّهُ وَبَانَتْ امْرَاَتُهُ ـ

"সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করেছে এবং তার স্ত্রী তার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।"

হযরত আলী রা. বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ النَّاسَ اَصَابُوْا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ اَحَدٌ عَلٰى امْرَاَتِهِ ـ

---

১৬. যেমন আমরা একটু আগেই বলে এসেছি—যে দাম্পত্য সম্পর্ক একবার একজন মহিলা ও একজন পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে, যতদূর সম্ভব তা টিকিয়ে রাখাই হচ্ছে শরীয়তের লক্ষ। আর যদি তা ছিন্ন করতেই হয়, তাহলে যখন সমঝোতা ও আপোষ-মীমাংসার যাবতীয় সুযোগ শেষ হয়ে যায় কেবল তখনই তা ভাঙতে হবে। এজন্য শরীয়তের দাবি হচ্ছে—যদি কেউ তালাক দিতে চায়, সে যেন চিন্তা-ভাবনা করেই তালাক দেয় এবং তালাক দেয়ার পরও আপোষ-মীমাংসা ও সংশোধনের দরজা তিন মাস পর্যন্ত খোলা থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি একই সময়ে তিন তালাক দেয়, সে এক আঘাতেই এসব সুযোগ শেষ করে দেয়।—গ্রন্থকার

"মানুষ যদি তালাকের যথার্থ সীমার দিকে লক্ষ রাখতো, তাহলে কোনো ব্যক্তিকেই নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হতো না।"

তালাকের পথে এতটা প্রতিবন্ধকতা রাখার পর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে কঠিন যে প্রতিবন্ধক রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 'মুগাল্লাযা তালাক'[১৭] দিবে, সে এ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে অপর ব্যক্তির কাছে বিবাহ না বসবে এবং সে ব্যক্তিও তাকে ভোগ করার পর স্বেচ্ছায় তালাক না দিবে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط ـ

"অতপর (দুই তালাক দেয়ার পর) স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়, তবে এ স্ত্রীলোকটি তার জন্য হালাল (পুনরায় বিবাহযোগ্য) হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য পুরুষ তার সাথে বিবাহ না করবে এবং সে তাকে স্বেচ্ছায় তালাক না দিবে। (দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয়ার পর) যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রেখে জীবন যাপন করতে পারবে তাহলে তাদের পুনঃবিবাহে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০

এ হচ্ছে এমন এক কঠিন শর্ত, যার কারণে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়ার পূর্বে শতবার চিন্তা করতে বাধ্য হবে। যতক্ষণ সে ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না পৌঁছবে যে, এ স্ত্রীর সাথে তার বসবাস করা আর সম্ভব নয়—ততক্ষণ সে তৃতীয় তালাকের নামও নেবে না।

কতিপয় লোক এ শর্ত থেকে বাঁচার জন্য ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়। যেমন কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে। এমতাবস্থায় সে এ স্ত্রীকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়। অতপর তাকে কিছু অর্থ দিয়ে স্ত্রীর সাথে নির্জনবাসের পূর্বেই তার থেকে তালাক আদায় করে নেয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাহলীল

১৭. 'তালাকে মুগাল্লাযা' অর্থাৎ তিন তালাক। এরপর এ স্ত্রীলোকটি পুনর্বার তার স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, যতক্ষণ অন্য ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে আবার বিচ্ছেদ না হবে।–গ্রন্থকার

(অর্থাৎ পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল) করার উদ্দেশ্যে কেবল বিবাহই যথেষ্ট নয়। যে পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার থেকে যৌনতৃপ্তি লাভ না করবে ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ

لاَ تُحِلُّ لِزَوْجِهَا الاَوَّلِ حَتّٰى يَذُوْقَ الاٰخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوْقَ عُسَيْلَتَهُ ـ

"দ্বিতীয় স্বামী তার মধু এবং সে এ দ্বিতীয় স্বামীর মধু (যৌন স্বাদ) পান না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল (বিবাহযোগ্য) হবে না।"

যে ব্যক্তি তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কেবল নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে বিবাহ দেয়, আর যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, এদের উভয়কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ـ

এরূপ ব্যক্তিকে তিনি تَيْسٌ مُسْتَعَارٌ অর্থাৎ ভাড়াটে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এ ধরনের বিবাহ আর যেনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

যেসব আলেম মানুষকে এ প্রকাশ্য হারাম এবং অত্যন্ত গর্হিত ও লজ্জাকর ছল-চাতুরীর পক্ষে ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাদের ব্যাপারে হতবাক হতে হয়।

খোলা

ইসলামী শরীয়ত যেভাবে পুরুষকে এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে স্ত্রীকে পসন্দ করে না অথবা যার সাথে কোনো রকমেই তার বসবাস করা সম্ভব নয়—তাকে সে তালাক দিতে পারে ; অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দিয়েছে যে, সে যে পুরুষকে পসন্দ করে না বা যার সাথে তার কোনো মতেই বসবাস করা সম্ভব নয়—সে তার থেকে খোলা করিয়ে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশের দুটি দিক রয়েছে ঃ এক. নৈতিক দিক, দুই. আইনগত দিক।

নৈতিক দিক এই যে, চাই পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক, প্রত্যেকে তালাক অথবা খোলার ক্ষমতা কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। শুধু যৌনচর্চার উদ্দেশ্যে তালাক ও খোলাকে যেন খেলনায় পরিণত করা না হয়। হাদীসের গ্রন্থসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশসমূহ বিবৃত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা স্বাদ অন্বেষণকারী ও স্বাদ অন্বেষণকারিণীদের আদৌ পসন্দ করেন না।"

لَعَنَ اللّٰهُ ذَوَّاقٍ مِّطْلَاقٍ ـ

"বারবার তালাকের পথ অবলম্বন করে অবাধ যৌনচর্চাকারীদের আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন।"

اَيُّمَا امْرَاَةٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِغَيْرِ نُشُوْزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ـ

"যে স্ত্রীলোক স্বামীর কোনোরূপ ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই খোলার আশ্রয় নেয়, তার ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতাকুল ও মানব জাতির অভিসম্পাত। খোলাকে খেলনায় পরিণতকারী স্ত্রীলোকেরা মুনাফিক।"

কিন্তু আইন—যার কাজ হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণ করা, তা নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে না ; তা পুরুষকে স্বামী হওয়ার প্রেক্ষিতে যেমন তালাকের অধিকার দেয়, অনুরূপভাবে নারীকে স্ত্রী হওয়ার প্রেক্ষিতে খোলার অধিকার দেয়, যেন উভয়ের জন্য প্রয়োজনবোধে বিবাহ বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয় এবং কোনো পক্ষকেই যেন এমন অবস্থায় না ফেলা হয় যে, অন্তরে ঘৃণা জমে আছে, বিবাহের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হচ্ছে না, অথচ দাম্পত্য সম্পর্ক একটা বিপদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন অপরজনের সাথে কেবল এ কারণেই বন্দী হয়ে আছে যে, এ বন্দীখানা থেকে মুক্তি লাভের কোনো উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে? এ ক্ষেত্রে আইন যতদূর সম্ভব যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু ন্যায় অথবা অন্যায়ভাবে ক্ষমতার ব্যবহার হওয়াটা স্বয়ং ক্ষমতা ব্যবহারকারীর যাচাই ক্ষমতা, তার সততা, ন্যায়-ইনসাফ ও আল্লাহ্ ভীতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। সে নিজে ও তার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এ বিচার করতে পারে না যে, সে কেবল অবাধ যৌনচর্চার উদ্দেশ্যে এ ক্ষমতা ব্যবহার করছে, না আসলে এ অধিকার ব্যবহার করার তার বৈধ প্রয়োজন। আইন তাকে তার প্রাপ্য অধিকার দেয়ার পর তা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য সে কেবল প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ তার ওপর আরোপ করতে পারে।

আপনারা তালাকের আলোচনায় দেখেছেন যে, পুরুষকে তার স্ত্রী থেকে আলাদা হওয়ার অধিকার দেয়ার সাথে সাথে তার ওপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন সে স্ত্রীকে মোহরানারূপে যা কিছু দিয়েছে এর ক্ষতি তাকে সহ্য করতে হবে, হায়েয চলাকালীন তালাক দিতে পারবে না, প্রতি তুহরে এক এক তালাক দিবে, ইদ্দাতের সময় স্ত্রীকে নিজের ঘরে রাখতে হবে। অতপর যখন সে তিন তালাক দিবে তখন তাহলীল ছাড়া এ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও খোলার অধিকার দেয়ার সাথে সাথে তার প্রতিও কতগুলো শর্ত আরোপ করে দেয়া হয়েছে, যা কুরআন মজীদের এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَآ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط - البقرة : ٢٢٩

"তোমরা স্ত্রীদের যাকিছু দিয়েছ (তালাকের সময়) তা থেকে সামান্য কিছুও ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু তারা উভয়ে যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অটুট রাখতে পারবে না (তবে এটা স্বতন্ত্র অবস্থা)। তোমরা যদি আশংকা করো যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমা রক্ষা করে জীবন যাপন করতে পারবে না— এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় প্রদান করে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাতে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

এ আয়াত থেকে আইনের নিম্নলিখিত ধারাসমূহ পাওয়া যায় ঃ

এক. এমন অবস্থায় খোলার আশ্রয় নিতে হবে যখন আল্লাহর সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা' শব্দগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যদিও 'খোলা' একটি মন্দ জিনিস, যেমন তালাক একটি মন্দ জিনিস, কিন্তু যখন এ আশংকা হয় যে, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘতি হয়ে যাবে তখন খোলা করে নেয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

দুই. স্ত্রী যখন বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় তখন তাকেও আর্থিক ক্ষতি মেনে নিতে হবে, যেভাবে পুরুষ স্বেচ্ছায় তালাক দিলে তাকেও আর্থিক ক্ষতি মেনে নিতে হয়। কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় তালাক দিলে সে স্ত্রীর কাছ থেকে মোহরানা হিসাবে প্রদত্ত অর্থের

সামান্য পরিমাণও ফেরত নিতে পারে না। যদি স্ত্রী বিচ্ছেদ কামনা করে তাহলে সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানার আকারে যে অর্থ গ্রহণ করেছিল তার অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণটা ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

তিন. فْتَدَتْ بِهِ। অর্থাৎ বিনিময় প্রদান করে মুক্তিলাভ করার জন্য শুধু বিনিময় প্রদানকারীর ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, বরং এ ব্যাপারটির আপোষ নিষ্পত্তি তখনই হবে যখন বিনিময় গ্রহণকারীও এতে সম্মত হবে অর্থাৎ স্ত্রী শুধু কিছু পরিমাণ অর্থ পেশ করে নিজেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে না, বরং তার দেয়া অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে স্বামীর তালাক দেয়া বিচ্ছিন্নতার জন্য অপরিহার্য।

চার. 'খোলা'র জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, স্ত্রী তার সম্পূর্ণ মোহরানা অথবা তার এক অংশ পেশ করে বিচ্ছেদের দাবি তুলবে এবং পুরুষ তা গ্রহণ করে তাকে তালাক দিবে। 'ফালা জুনাহা আলাইহিমা ফীমাফতাদাত বিহী'–বাক্যাংশ থেকে জানা যায়, খোলার কাজটি উভয় পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। যেসব লোক খোলার কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য আদালতের ফায়সালাকে শর্ত হিসাবে জুড়ে দেয়—এ আয়াতের মাধ্যমে তাদের ধারণার অপনোদন হয়ে যায়। যে বিষয়গুলো পরিবারের অভ্যন্তরে মীমাংসা করা সম্ভব তা আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া ইসলাম আদৌ পসন্দ করে না।

পাঁচ. যদি স্ত্রী 'ফিদয়া' (মুক্তির বিনিময়) পেশ করে এবং স্বামী তা গ্রহণ না করে, তাহলে এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য আদালতের আশ্রয় নেয়ার অধিকার আছে। যেমন উপরোল্লিখিত আয়াতে—'ফাইন খিফতুম আল্লা ইউকীমা হুদূদাল্লাহ'—থেকে প্রকাশ্যভাবে জানা যায়। এ আয়াতে 'খিফতুম' বলে মুসলমানদের 'উলিল আমর' বা সরকারী কর্মকর্তাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু আমীর বা শাসকদের সর্বপ্রথম দায়িত্বই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমার হেফাযত করা, তাই যখন আল্লাহর সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা প্রকাশ পায় তখন তার কর্তব্য হচ্ছে এ সীমারেখার হেফাযত করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে (স্ত্রীকে) যেসব অধিকার দিয়েছেন তা তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ। এখানে একথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই যে, আল্লাহর সীমালংঘন হওয়ার আশংকা কোন্ কোন্ অবস্থায় সাব্যস্ত হবে?

'ফিদয়া'র পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইনসাফ কিভাবে হবে ? স্ত্রী যদি ফিদয়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু স্বামী যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে এ অবস্থায় বিচারকের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা উচিত ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সামনে খোলার যেসব মোকদ্দমা এসেছিল তার কার্যবিবরণী থেকে আমরা এসব প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব পেয়ে যাবো।

হিজরী প্রথম শতকের খোলার দৃষ্টান্তসমূহ

খোলার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা হচ্ছে সাবিত ইবনে কায়েস রা.-এর। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর কাছ থেকে খোলা অর্জন করে নিয়েছিলেন। এ মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের বিভিন্ন অংশ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। অংশগুলোকে একত্র করলে জানা যায়, সাবিত রা. থেকে তাঁর দুই স্ত্রী খোলা অর্জন করেছিলেন। এক স্ত্রী হচ্ছেন জামীলা বিনতে উবাই ইবনে সালুল (আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বোন)।[১৮] তাঁর ঘটনা এই যে, সাবিতের চেহারা তাঁর পসন্দনীয় ছিল না। তিনি খোলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন এবং নিম্নোক্ত ভাষায় নিজের অভিযোগ পেশ করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ رَأْسِيْ وَرَأْسَهُ شَيْءٌ اَبَدًا اِنِّيْ رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ اَقْبَلَ فِي عِدَةٍ فَاِذَا هُوَ اَشَدُّهُمْ سَوَادًا وَاَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَاَقْبَحُهُمْ وَجْهًا -

"হে আল্লাহর রসূল! আমার মাথা ও তার মাথাকে কোনো বস্তু কখনও একত্র করতে পারবে না। আমি ঘোমটা তুলে তাকাতেই দেখলাম, সে কতগুলো লোকের সাথে সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশী কালো, সবচেয়ে বেঁটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম।"–ইবনে জারীর

وَاللّٰهِ مَا كَرِهْتُ مِنْهُ دِيْنًا وَّلاَ خُلُقًا اِلاَّ اِنِّيْ كَرِهْتُ دِمَامَتَهُ -

"আল্লাহর শপথ! আমি তার দীনদারী ও নৈতিকতার কোনো ত্রুটির কারণে তাকে অপসন্দ করছি না, বরং তার কুৎসিত চেহারাই আমার কাছে অপসন্দনীয়।"–ইবনে জারীর

---

১৮. কেউ কেউ যয়নব বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর নাম জামীলা এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কন্যা নন, বরং বোন।–গ্রন্থকার

وَاللّٰهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللّٰهِ اِذَا دَخَلَ عَلَىَّ بَصَقْتُ فِى وَجْهِهٖ -

"আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তাহলে যখন সে আমার কাছে আসে, আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম।"

–ইবনে জারীর

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِىْ مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرٰى وَثَابِتٌ رَجُلٌ دَمِيْمٌ -

"হে আল্লাহর রসূল! আমি কিরূপ সুন্দরী ও সুশ্রী তা আপনি দেখছেন। আর সাবিত হচ্ছে এক কুৎসিত ব্যক্তি।"–ফাতহুল বারীর হাওয়ালায় আবদুর রায্যাক।

وَمَا اَعْتَبُ عَلَيْهِ فِىْ خُلُقٍ وَّلَا دِيْنٍ وَّلٰكِنِّىْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الْاِسْلَامِ -

"আমি তার দীনদারী ও নৈতিকতার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করছি না। কিন্তু ইসলামে আমার কুফরের ভয় হচ্ছে।"[১৯]-বুখারী

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগ শুনলেন, অতপর বললেন ঃ

اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ الَّتِىْ اَعْطَاكِ -

"সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তা ফেরত দিবে ?"

উত্তরে তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি তা ফেরত দিতে রাজি আছি, বরং সে যদি আরো অধিক চায়, তাও দিবো।"

নবী স. বললেন ঃ

اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلٰكِنْ حَدِيْقَتَهُ -

"অধিক কিছু নয়, তুমি কেবল তার বাগানটিই ফেরত দাও।"

---

১৯. 'ইসলামে কুফরের ভয়' কথাটার অর্থ হচ্ছে–ঘৃণা ও অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমি তার সাথে বসবাস করি তাহলে আমার আশংকা হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও সতীত্বের হেফাযতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন–আমি তা পালন করতে সক্ষম হবো না। এ হচ্ছে একজন ঈমানদার নারীর দৃষ্টিভংগী, যিনি আল্লাহ নির্ধারিত সীমালংঘন করাকে কুফরী মনে করেন। অথচ বর্তমান যুগের মৌলভীদের দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, যদি নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত কিছুই আদায় না করা হয় এবং প্রকাশ্যে ফাসেকী ও গর্হিত কাজ করা হয়—তবুও তারা এ অবস্থাকে একটি ঈমানী অবস্থা বলে আখ্যায়িত করতে বদ্ধপরিকর এবং এ ধরনের ব্যক্তিদের তারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করতে থাকেন। আর যে ব্যক্তি এটাকে ঈমানের পরিপন্থী অবস্থা বলেন, তাকে তারা 'খারিজী' আখ্যা দেন।–গ্রন্থকার

অতপর তিনি সাবিত রা.-কে নির্দেশ দিলেন ঃ

اَقْبِلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً-

"তুমি তোমার বাগান গ্রহণ করো এবং তাকে এক তালাক দাও।"

হযরত সাবিত রা.-এর আর এক স্ত্রী ছিলেন হাবীবা বিনতে সাহল আল আনসারিয়াহ রা.। তাঁর ঘটনা ইমাম মালিক ও ইমাম আবু দাউদ র. এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন খুব ভোরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়েই হাবীবা রা.-কে দরজায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি ? তিনি বললেন ঃ

لاَ اَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ-

"আমার ও সাবিত ইবনে কায়েসের মধ্যে মিলমিশ হবে না।"

যখন সাবিত রা. উপস্থিত হলেন নবী স. বললেন ঃ দেখো এ হচ্ছে হাবীবা বিনতে সাহল। এরপর সাবিত রা. যা কিছু বলার তাই বললেন। হাবীবা রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সাবিত আমাকে যাকিছু দিয়েছেন তা সবই আমার কাছে আছে। নবী স. সাবিত রা.-কে নির্দেশ দিলেন ঃ

"এসব কিছু তুমি ফেরত নাও এবং তাকে বিদায় করে দাও।"

কোনো কোনো বর্ণনায় خَلِّ سَبِيْلَهَا এবং কোনো কোনো হাদীসে فَارِقْهَا শব্দ রয়েছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। আবু দাউদ ও ইবনে জারীর হযরত আয়েশা রা. থেকে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত সাবিত রা. হাবীবাকে এমন মার দিয়েছিলেন যে, তাঁর হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হাবীবা নবী স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। তিনি সাবিত রা.-কে আদেশ দিলেন ঃ "খুয বা'দু মালিহা ওয়া ফাররিকহা"- "তার সম্পদের কিছু অংশ নিয়ে নাও এবং তাকে পৃথক করে দাও।"

কিন্তু ইবনে মাজা হাবীবা রা.-এর প্রসংগে যেসব শব্দ বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায়, সাবিত রা.-এর বিরুদ্ধে হাবীবা রা.-এর যে অভিযোগ ছিল তা মারধোরের নয়, বরং তাঁর কুৎসিত আকৃতির। সুতরাং তিনিও একই অভিযোগ এনেছেন। হাদীসে জামীলা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'যদি আল্লাহর ভয় না হতো তাহলে আমি সাবিতের মুখে থুথু দিতাম।'

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে এক মহিলা ও এক পুরুষের মোকদ্দমা পেশ করা হলো। তিনি স্ত্রীলোকটিকে উপদেশ দিলেন এবং স্বামীর সাথে বসবাস করার পরামর্শ দিলেন। স্ত্রীলোকটি তাঁর পরামর্শ

গ্রহণ করেনি। এতে তিনি একটি ময়লা-আবর্জনায় পূর্ণ কুঠরিতে তাকে আবদ্ধ করে দিলেন। তিন দিন বন্দী করে রাখার পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তোমার কি অবস্থা ?" সে বললো, "আল্লাহর শপথ! এ রাত কয়টিতে আমার কিছুটা শান্তি হয়েছে।" একথা শুনে হযরত উমর রা. তার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন ঃ

اِخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا ـ

"তোমার জন্য দুঃখ হয়, কানের বালির মত সামান্য অলংকারের বিনিময়ে হলেও একে খোলা দিয়ে দাও।"[২০]

'রুবাই' বিনতে মুআওবিয ইবনে আফরা রা. তাঁর সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করিয়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামী তা মানলো না। হযরত উসমান রা.-এর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করা হলো। তিনি স্বামীকে নির্দেশ দিলেন ঃ

فَاَجَازَهُ وَاَمَرَهُ بِاَخْذِ عِقَاسِ رَأْسِهَا فَمَا دُوْنَهُ ـ

"তার চুল বাঁধার 'ফিতাটা' পর্যন্ত নিয়ে নাও এবং তাকে 'খোলা' দিয়ে দাও।"[২১]

খোলার বিধান

এসব হাদীস থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ

১. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ সাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রীদের থেকে বর্ণিত অভিযোগই হচ্ছে এ আয়াতের তাফসীর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উত্থাপিত অভিযোগকে খোলার জন্য যথেষ্ট মনে করলেন যে, তাঁদের স্বামীর চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত এবং তাঁরা তাঁকে মোটেই পসন্দ করেন না। তিনি তাঁদেরকে সৌন্দর্যের দর্শনের ওপর কোনো বক্তৃতা দেননি। কেননা তাঁর দৃষ্টি ছিল শরীয়তের উদ্দেশ্যের দিকে। যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, এ মহিলার অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি জমে গেছে, তিনি তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। কেননা ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় একজন নারী ও একজন পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে পরস্পরের সাথে জবরদস্তিমূলক বেঁধে রাখার পরিণতি দীন, আমল-আখলাক এবং সমাজ-সভ্যতার জন্য তালাক ও খোলার

২০. 'কাশফুল গুম্মাহ,' ২য় খণ্ড।

২১. ফাতহুল বারীর হাওয়ালায়–আবদুর রায্যাক।

চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। এতে শরীয়তের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কর্মধারা থেকে এ আইন পাওয়া যায় যে, খোলার বিধান কার্যকর করার জন্য কেবল এতটুকু প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট যে, স্ত্রী স্বামীকে নেহায়েত অপসন্দ করে এবং সে তার সাথে বসবাস করতে রাজী নয়।

২. হযরত উমর রা.-এর কর্মনীতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য বিচারক যে কোনো উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, যেন সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এদের মধ্যে এখন আর মিলমিশ হওয়ার কোনো আশা নেই।

৩. হযরত উমর রা.-এর কর্মনীতি থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির কারণ অনুসন্ধান করা জরুরী নয়। এটা যুক্তিসংগত কথা, স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার এমন অনেক কারণ থাকতে পারে যা অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা যায় না। বিতৃষ্ণার কারণগুলো এমন পর্যায়েরও হতে পারে যা বর্ণনা করা হলে শ্রবণকারী এটাকে ঘৃণার জন্য যথেষ্ট নাও মনে করতে পারে। কিন্তু দিন-রাত সে এ কারণগুলোরই সম্মুখীন হয় এবং তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করার জন্য এগুলো যথেষ্ট। অতএব কাযীর দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণা জমা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। স্ত্রীলোকটি যেসব কারণ বর্ণনা করেছে, তা ঘৃণা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট কিনা সেই ফায়সালা করা তার দায়িত্ব নয়।

৪. বিচারক উপদেশ দিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর সাথে থাকার জন্য সম্মত করার চেষ্টা অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করতে পারবেন না। কারণ খোলা তার ব্যক্তিগত অধিকার যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন এবং সে যদি এ আশংকা প্রকাশ করে যে, এ স্বামীর সাথে বসবাস করতে গেলে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, এমতাবস্থায় তাকে একথা বলার কারো অধিকার নেই ঃ তুমি চাইলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করতে পারো, কিন্তু এ ব্যক্তির সাথেই তোমাকে থাকতে হবে।

৫. 'খোলা'র মোকদ্দমার ক্ষেত্রে বিচারকের অনুসন্ধানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে, স্ত্রী কি ন্যায্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে খোলার দাবি করছে, না কেবল প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে বিচ্ছেদ চাচ্ছে? এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বিচারক হিসাবে যখন

খোলার মোকদ্দমাগুলোর বিবরণ শুনেছেন তখন এ প্রসংগটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। এর কারণ ঃ

প্রথমত, এ অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান করা কোনো বিচারকের পক্ষেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, নারীর খোলার অধিকার হচ্ছে পুরুষের তালাকের অধিকারের বিকল্প। অবাধ যৌনচর্চার প্রশ্ন তুললে উভয় ক্ষেত্রেই তার সমান আশংকা রয়েছে। কিন্তু আইনে পুরুষের তালাকের অধিকার প্রয়োগকে অবাধ যৌনচর্চার আশংকার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সুতরাং আইনগত অধিকারের দিক থেকে স্ত্রীর খোলার অধিকারকেও কোনো নৈতিক শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, কথা হচ্ছে, খোলা দাবিকারিণী কোনো মহিলা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয় খোলা দাবি করার পক্ষে তার বাস্তবসম্মত প্রয়োজন রয়েছে অথবা সে অবাধ যৌনচর্চায় লিপ্ত হওয়ার জন্য খোলার দাবি করছে। প্রথম ক্ষেত্রে তার খোলার দাবি প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় হবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে খোলার ক্ষমতা না দিলে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত হবে। কারণ যে নারী দ্বিচারিণী হবে সে তার যৌনতৃপ্তির জন্য কোনো না কোনো পথ খুঁজতে থাকবেই। আপনি যদি তাকে বৈধ পন্থায় এটা করতে না দেন তাহলে সে অবৈধ পন্থায় তার কুস্বভাবের চাহিদা পূরণ করবেই এবং তা হবে অধিক গর্হিত কাজ। কোনো নারীর পরপর পঞ্চাশজন স্বামী বদল করা—একজন স্বামীর অধীনে থেকে একবার 'যেনা'য় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম।

৬. স্ত্রী যদি খোলা দাবি করে, আর স্বামী যদি তাতে সম্মত না হয়, তাহলে বিচারক তাকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দিবেন। পূর্বোল্লিখিত হাদীসের সবগুলো বর্ণনায় এরূপই এসেছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন এসব ক্ষেত্রে সম্পদ বা নগদ অর্থ গ্রহণ করে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যাই হোক, বিচারকের নির্দেশের অর্থও তাই এবং স্বামী তা মেনে নিতে বাধ্য। এমনকি সে যদি তা মেনে না নেয়, তাহলে কাযী তাকে বন্দী করতে পারবেন। কারণ শরীয়তে কাযীর মর্যাদা কেবল একজন পরামর্শ দাতার পর্যায়ের নয় যে, তাঁর আদেশ পরমার্শ হিসাবে বিবেচিত হবে, আর যার বিরুদ্ধে রায় দেয়া হয়েছে—তার এটা মানা বা না মানার এখতিয়ার থাকবে। বিচারকের মর্যাদা যদি তাই হতো তাহলে মানুষের জন্য তার আদালতের দরজা খোলা থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক ছিল।

৭. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী খোলার পরিণতি হচ্ছে 'এক তালাকে বায়েন'। অর্থাৎ খোলার হুকুম কার্যকর হওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দাত চলাকালীন তাকে পুনঃগ্রহণের অধিকার স্বামীর থাকবে না। কেননা পুনঃগ্রহণের অধিকার অবশিষ্ট থাকলে 'খোলা'র উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়। এছাড়া স্ত্রী যে অর্থ তাকে দিয়েছে তা বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যই দিয়েছে। স্বামী যদি তা গ্রহণ করে তাকে রেহাই না দেয় তাহলে এটা হবে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। শরীয়ত কিছুতেই এটা জায়েয রাখে না। হাঁ, যদি স্ত্রীলোকটি স্বেচ্ছায় তার কাছে পুনরায় বিবাহ বসতে চায় তবে তা সে করতে পারে। কারণ এটা মুগাল্লাযা তালাক নয়। এই শেষোক্ত ধরনের তালাকের পর দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য তাহলীল শর্ত।

৮. খোলা'র বিনিময় নির্ধারণে আল্লাহ তাআলা কোনো শর্ত আরোপ করেননি। যে কোনো পরিমাণ সম্পদের বিনিময়ে স্বামী-স্ত্রী সম্মত হবে, তার ওপরই খোলা হতে পারে। কিন্তু খোলার বিনিময়ে স্বামীর দেয়া মোহরানার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপসন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يَاْخُذُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهَا ـ

"কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পরিমাণ মোহরানা দিয়েছে খোলার সময় সে এর অধিক পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে না।"

হযরত আলী রা. এটাকে স্পষ্ট ভাষায় মাকরূহ বলেছেন। মুজতাহিদ ইমামদের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর যুলুম-নির্যাতনের কারণে খোলার দাবি করে তাহলে বিনিময় গ্রহণ করা মূলত স্বামীর জন্য মাকরূহ। যেমন হিদায়া কিতাবে আছে ঃ

وَاِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهِ يَكْرَهُ لَهُ اَنْ يَّاْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا ـ

"স্বামীর পক্ষ থেকে যুলুম-নির্যাতন হয়ে থাকলে খোলার সময় স্ত্রীর কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ।"

এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে সামনে রেখে শরীয়তের মূলনীতির অধীনে খোলার অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে ঃ

ক. খোলা প্রার্থনাকারী স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর অত্যাচার প্রমাণিত করতে পারে অথবা এমন কোনো কারণ দাঁড় করাতে পারে যা কাযীর কাছে যুক্তিসংগত মনে হবে—তাহলে কাযী তাকে মোহরানার একটা সামান্য

অংশ অথবা অর্ধেক ফেরত দেয়ার বিনিময়ে তাকে খোলার ব্যবস্থা করে দিবেন।

খ. যদি সে স্বামীর নির্যাতন অথবা গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ পেশ না করে তাহলে সম্পূর্ণ মোহরানা অথবা এর একটা বিরাট অংশ ফেরত দেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয়া হবে।

গ. কিন্তু কাযী যদি স্ত্রীলোকটির হাবভাব ও আচরণের মধ্যে অবাধ যৌনচর্চার আলামত দেখতে পান, তাহলে তিনি শাস্তিস্বরূপ তাকে মোহরানা অধিক পরিমাণ অর্থ প্রদানে বাধ্য করতে পারেন।

খোলার মাসয়ালায় একটি মৌলিক গলদ

খোলার উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ বাস্তব সত্য প্রকটিত হয়ে ওঠে যে, ইসলামী আইনে নারী ও পুরুষের অধিকারের মধ্যে কতটা সঠিক ভারসাম্য স্থাপন করা হয়েছে। এখন এটা আমাদের নিজেদেরও ভ্রান্তি যে, আমরা আমাদের নারীদের হাত থেকে কার্যত খোলার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছি এবং শরীয়তের মূলনীতির বিপরীত খোলা দেয়া বা না দেয়াকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের ইচ্ছার ওপর সীমাবদ্ধ করে দিয়েছি। এর ফলে প্রতিনিয়ত নারীদের যে অধিকার খর্ব হয়েছে ও হচ্ছে, এজন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান মোটেই দায়ী নয়। এখনো যদি নারীদের এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের দাম্পত্য জীবনে সৃষ্ট অনেক সমস্যারই জট খুলে যাবে। সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পথই বন্ধ হয়ে যাবে।

"আইনপ্রণেতা খোলার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে রেখে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কাযীর এখতিয়ার বহির্ভূত"— এ ভ্রান্ত ধারণাই কার্যত নারীর হাত থেকে খোলার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে। পরিণাম হচ্ছে এই যে, খোলা দেয়া বা না দেয়া সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মরযির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যদি স্ত্রী খোলা হাসিল করতে চায় আর স্বামী নিজের দুষ্টামি, কপটতা অথবা হীনস্বার্থ সিদ্ধির জন্য তা না দিতে চায় তাহলে স্ত্রীর জন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এটা আইনদাতার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট এক পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে অসহায় করে সমস্ত ক্ষমতা অন্য পক্ষের হাতে তুলে দেয়া কখনও শরীয়ত প্রদানকারীর উদ্দেশ্য ছিল না। যদি এরূপ হতো তাহলে তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের সাথে যে উৎকৃষ্ট নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সংযুক্ত করেছেন তা বিলীন হয়ে যেত।

যেমন ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়তে দাম্পত্য আইনের ভিত্তি এ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, পুরুষ ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক যতক্ষণ পবিত্র নৈতিকতা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে কায়েম থাকতে পারে, তাকে আরো সুন্দর করা একান্ত জরুরী এবং একে ছিন্ন করা বা করানোর চেষ্টা কঠোর অপ্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু যখন এ সম্পর্ক উভয়ের জন্য অথবা উভয়ের মধ্যে কোনো একজনের নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অথবা তার মধ্যে ভালোবাসা-আন্তরিকতার স্থলে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এ বিবাহ ভেঙে দেয়াই জরুরী এবং তা বহাল রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ মূলনীতির অধীনে শরীয়ত বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়কে এমন এক একটি আইনগত অস্ত্র দিয়েছে যে, বিবাহ বন্ধন অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছে গেলে সে তা সহজেই কাজে লাগাতে পারে। পুরুষের আইনগত অস্ত্রের নাম হচ্ছে 'তালাক'। এর ব্যবহারের জন্য তাকে স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতে স্ত্রীর আইনগত হাতিয়ারের নাম হচ্ছে 'খোলা'। এর ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, সে যখন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চায়, তখন সে প্রথমে স্বামীর কাছে এটা দাবি করবে। সে যদি স্ত্রীর দাবি পূর্ণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে সে কাযীর সাহায্য নেবে।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে এভাবেই ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রকৃতপক্ষে এ ভারসাম্যই স্থাপন করেছেন। কিন্তু মাঝখান থেকে কাযীর শ্রবণ করার ক্ষমতাকে খারিজ করে এ ভারসাম্য বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কেননা নারীকে আইন অনুযায়ী যে হাতিয়ার দেয়া হয়েছিল, তা এভাবে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে এবং কার্যত আইনের রূপ বিকৃত হয়ে এমন হয়ে গেছে যে, পুরুষ যদি দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা করে অথবা এ সম্পর্ক তার জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে সে তা ছিন্ন করতে পারবে। কিন্তু যদি স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ একই আশংকা দেখা দেয় অথবা দাম্পত্য সম্পর্ক তার জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে তাহলে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনো উপায় তার হাতে থাকে না। পুরুষ যতক্ষণ তাকে মুক্ত করে না দেয়, সে এ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য, চাই তার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ওপর কায়েম থাকা অসম্ভবই হোক না কেন এবং বিবাহের শরঈ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যাহত হোক না কেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শরীয়তের ওপর এরূপ সুস্পষ্ট বে-ইনসাফী ও অবিচারের দোষারোপ করার এতটা দুঃসাহস কারো মধ্যে আছে কি ? কেউ যদি এ দুঃসাহস করে তাহলে ফিক্‌হবিদদের মতামত নয়, বরং কিতাব ও

সুন্নাহ থেকে তাকে এ প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল খোলার ব্যাপারে কাযীকে কোনো অধিকার বা কর্তৃত্ব দেননি।

খোলার ব্যাপারে কাযীর এখতিয়ার

কুরআন মজীদের যে আয়াতে খোলার নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তা আবার পড়ুন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط ـ

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে তাদের জন্য এটা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয় যে, সে (স্ত্রী) কিছু ফিদ্য়া (বিনিময়) দিয়ে বিচ্ছিন্নতা অর্জন করবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

এ আয়াতে স্বয়ং স্বামী-স্ত্রীকে নামপুরুষের (3rd person dual Number) ক্রিয়াপদে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং خِفْتُمْ (যদি তোমাদের আশংকা হয়) শব্দটিতে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। এখন অবশ্যই মানতে হবে যে, মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ে কর্তৃত্বসম্পন্ন (উলিল আমর) লোককেই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে এবং আল্লাহর নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে খোলা সম্পন্ন না হলে তা 'উলিল আমরে'র কাছে রুজু করতে হবে।

আমরা উপরে যেসব হাদীস উল্লেখ করে এসেছি সেগুলো থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের কাছে খোলার দাবি নিয়ে স্ত্রীলোকদের আগমন এবং তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা স্বয়ং একথাই প্রমাণ করে যে, খোলার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মত হওয়া সম্ভব না হলে স্ত্রীলোকটি কাযীর শরণাপন্ন হবে। এখন কাযী যদি বাস্তবিকপক্ষে শুধু অভিযোগ শোনার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু পুরুষ লোকটির সম্মত না হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে নিজের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য করার ক্ষমতা না রাখেন, তাহলে কাযীকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ তাঁর কাছে না গেলে যে ফল দাঁড়াত, তাঁর কাছে গিয়েও সেই একই ফল হচ্ছে। কিন্তু হাদীসের ভাষ্য থেকে কি একথা প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে কাযীর কোনো এখতিয়ার নেই? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যতগুলো ফায়সালা উপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সবকটিতে নির্দেশসূচক (Imperative) বক্তব্য এসেছে।

যেমন طَلِّقْهَا (তাকে তালাক দাও) এবং فَارِقْهَا (তাকে পৃথক করে দাও) এবং خَلِّ سَبِيْلَهَا (তার পথ ছেড়ে দাও) অথবা বলা হয়েছে, তিনি (রসূল) পুরুষ লোকটিকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'তুমি এরূপ করো'। ইবনে জারীর র. ইবনে আব্বাস রা. থেকে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দগুলো হচ্ছে 'ফাফাররাকা বাইনাহুমা' (অতপর তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন)। স্বয়ং জামীলা বিনতে উবাই ইবনে সালূলের বর্ণনায়ও এ শব্দগুলো উল্লিখিত হয়েছে। এরপরও একথা বলার কোনো সুযোগ থাকে না, 'খোলার ব্যাপারে কাযীর হুকুম দেয়ার কোনো এখতিয়ার নেই।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্বামী যদি কাযীর এ হুকুমকে পরামর্শ মাত্র মনে করে তা মানতে অস্বীকার করে, তাহলে তিনি কি জোরপূর্বক তাকে নিজের হুকুম মানাতে বাধ্য করতে পারবেন ? এর জবাব হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের এরূপ কোনো দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না যে, তিনি কোনো ফায়সালা দিয়েছেন আর কেউ তাঁর সামনে মাথানত না করার দুঃসাহস করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি সিদ্ধান্তের ওপর অনুমান (কিয়াস) করতে পারি। এতে তিনি এক উদ্ধত স্বামীকে বলেছিলেন ঃ

لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتّٰى تَرْضٰى بِمِثْلِ مَا رَضِيَتْ بِهٖ-

"অনুরূপ স্ত্রীলোকটি যেভাবে বিচারকের ফায়সালা মেনে নিয়েছে, তুমি যতক্ষণ তা মেনে না নিবে ততক্ষণ তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে না।"

বিচারকের ফায়সালা মানতে অস্বীকার করার দরুন তিনি যদি কোনো স্বামীকে বন্দী করার ক্ষমতা রাখেন তাহলে তিনি নিজের ফায়সালা মেনে নিতে তার ওপর শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এমন কোনো কারণ নেই যে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে কেবল এক খোলার ব্যাপারেই কাযীর অধিকারের ব্যতিক্রম করা হবে। ফিকহের কিতাবসমূহে এমন অনেক খুঁটিনাটি মাসয়ালা পাওয়া যায় যেখানে কাযীকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, স্বামী যদি তাঁর নির্দেশে তালাক না দেয় তাহলে তিনি নিজেই উভয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবেন। তাহলে খোলার ক্ষেত্রে তাঁর এরূপ ক্ষমতা কেন থাকবে না ?

সামনে অগ্রসর হয়ে যে আলোচনা করা হবে তা থেকে এ সত্য আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, নপুংসক, লিংগ কর্তিত, খোজা, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত এবং উন্মাদ স্বামীদের ক্ষেত্রে মহান ফিক্‌হ্‌বিদগণ যেসব নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেছেন এবং অনুরূপভাবে মেয়েদের বালেগ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের

নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার (খিয়ারে বুলূগ) এবং এছাড়া অন্যান্য মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভিত্তিতে যেসব আইন-কানুন নির্ধারিত করেছেন, তার বর্তমানে নারীদের খোলা দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা কাযীর হাতে থাকা অত্যন্ত জরুরী, অন্যথায় যেসব মহিলা এরূপ করুণ অবস্থায় নিপতিত হবে তাদের জন্য দুটি পথ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। হয় তারা সারা জীবন মুসীবতের মধ্যে কাটাবে অথবা আত্মহত্যা করবে কিংবা নিজেদের জৈবিক উত্তেজনায় বাধ্য হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে অথবা ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করবে। আলোচ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

সহবাসে অক্ষম বা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির ব্যাপারে ফিক্‌হের মাসয়ালা এই যে, তাকে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এক বছরের সময় দেয়া হবে। চিকিৎসা গ্রহণের পর সে যদি একবারও সংগম করতে সক্ষম হয়, এমন কি অপূর্ণ সহবাসেও[২২] সক্ষম হয়, তাহলে বিবাহ বাতিল করার অধিকার স্ত্রীর থাকবে না, বরং তার এ অধিকার চিরকালের জন্য রহিত হয়ে গেল। বিবাহের সময় স্ত্রীর জানা ছিল যে, তার স্বামী নপুংসক। এরপরও সে তার সাথে বিবাহ বসতে সম্মত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি নিয়ে বিচারকের কাছে যাওয়ার মূলত তার কোনো অধিকার নেই।[২৩] পুরুষ লোকটি বিবাহের পর একবার সহবাস করার পর পুরুষত্বহীন হয়ে গেছে, তবুও স্ত্রীলোকটি বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি উত্থাপন করার অধিকার রাখে

---

(২২) فى رد المحتار عن المعراج اذا اولج الحشفة فقط فليس بعنين وان كان مقطوعا فلا بد من ايلاج بقية الذكر۔

"রদ্দুল মুহ্তার গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ থলথলে হয়ে গেছে সে যদি মাত্র একবার পুরুষাংগের অগ্রভাগ স্ত্রী অংগে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয় তাহলে সে নপুংস বা পুরুষত্বহীন নয়। তার পুরুষাঙ্গ যদি কর্তিত হয় এবং সে যদি এর অবশিষ্ট অংশ স্ত্রীর অংগে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয় তাহলেও সে নপুংসক বা পুরুষত্বহীন নয়।"

(২৩) وفى العالمگيرية ان علمت المراة وقت النكاح انه عنين لايصل الى النساء لايكون لها حق الخصومة .

"আলমগীরী নামক ফিক্‌হের কিতাবে আছে, বিবাহের সময় স্ত্রীর যদি জানা থাকে যে, তার স্বামী নপুংসক এবং স্ত্রীলোকদের সাথে মিলিত হতে অক্ষম, তাহলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার তার নেই।"

না।[২৪] বিবাহের পর স্ত্রীলোকটি জানতে পারলো তার স্বামী নপুংসক, এরপরও সে তার সাথে ঘর-সংসার করার জন্য সম্মত হলো, এক্ষেত্রেও সে বিবাহ বাতিল করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।[২৫]

এসব অবস্থায় স্ত্রীলোকটির বিবাহ বাতিল করার ক্ষমতা তো এভাবে বাতিল হয়ে গেল। এরপর এ অপদার্থ স্বামীর হাত থেকে মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পথ হচ্ছে—খোলা দাবি করা। কিন্তু তাও সে পেতে পারে না। কেননা সে যখন স্বামীর কাছে খোলা দাবি করে তখন সে সম্পূর্ণ মোহরানা অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী গ্রহণ করেও তাকে পরিত্যাগ করতে রাজী নয়। সে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করলে আদালত স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করতে অথবা উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। এখন চিন্তা করুন, এ বেচারী মহিলার কি পরিণতি হবে ? হয় সে আত্মহত্যা করবে অথবা খৃষ্টান মহিলা পাদ্রীর ন্যায় বৈরাগ্যের জীবন যাপন করবে এবং মানসিক যাতনা ভোগ করতে থাকবে অথবা বিবাহ বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করে গর্হিত কাজে লিপ্ত হবে অথবা দীন ইসলামকে একদম 'খোদা হাফেজ' বলবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য কি এই হতে পারে যে, কোনো স্ত্রীলোক উল্লিখিত পরিস্থিতির কোনো একটিতে নিমজ্জিত হোক ? শরীয়তের যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা কি এ ধরনের দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে? এ ধরনের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হতে পারে ? তারা কি একত্র হয়ে সমাজ ও সভ্যতার জন্য কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হবে ? তাদের ঘরে কি কখনো খুশী ও আনন্দের বার্তাবাহক ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারবে ? এ ধরনের দাম্পত্য বন্ধন কি কোনো দিক থেকে সুরক্ষিত দুর্গের

---

(২৪) فى الدر المختار فلوجب بعد وصوله اليهامرة او صار عنينا بعده اى الوصول لا يفرق لحصول حقها بالوطى مرة -

"দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে, স্ত্রীর সাথে একবার সহবাস করার পর যদি পুরুষাংগ থলথলে হয়ে যায় অথবা নপুংসক হয়ে যায় তাহলে এ সংগম স্বাদ লাভ করার পর স্ত্রীলোকটি বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি তোলার অধিকার রাখে না।"

(২৫) قال الشامى قوله لم يبطل اى مالم تقل رضيت بالمقام معه -

"আল্লামা শামী বলেন, 'বাতিল হবে না' বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী যতক্ষণ না বলবে, 'আমি তার সাথে ঘর-সংসার করতে সম্মত আছি', ততক্ষণ তার বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করার অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার বাতিল হবে না।"

সংজ্ঞায় আসতে পারে এবং এর দ্বারা দীন, নৈতিক চরিত্র ও মান-সম্ভ্রমের হেফাযত হতে পারে ? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি না—সূচক হয় তাহলে বলুন, একজন নিরপরাধ মহিলার জীবন বরবাদ হওয়া অথবা বাধ্য হয়ে গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া অথবা দীন ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাওয়ার দায়-দায়িত্ব কার মাথায় চাপবে ? আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তো নিশ্চয়ই দায়িত্বমুক্ত। কেননা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় নবী নিজেদের দেয়া আইনের মধ্যে এ ধরনের কোনো ত্রুটির অবকাশ রাখেননি।

❐

শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা

তালাক ও খোলার আলোচনায় ইসলামী আইনের যে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ আইন যে মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে তা হচ্ছে—নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক যদি অটুট থাকে তাহলে তা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাযত এবং ভালোবাসা ও সম্প্রীতির সাথে অক্ষুণ্ন থাকতে হবে। এটাকে কুরআন মজীদে 'ইমসাক বিলমা'রূফ'-এর মত সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি এভাবে তাদের মিলেমিশে থাকা সম্ভব না হয় তাহলে 'তাসরীহুম বি-ইহসান' হওয়া উচিত অর্থাৎ যে স্বামী-স্ত্রী সরলভাবে মিলেমিশে থাকতে সক্ষম না হবে তারা সহজভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এরূপ অবস্থার সৃষ্টি যেন না হতে পারে যে, তাদের পারস্পরিক সংঘাতে শুধু তাদের জীবনই তিক্ত হয়ে উঠবে না, বরং উভয়ের পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে, সমাজে আবর্জনা ছড়িয়ে পড়বে, নৈতিক বিপর্যয় প্রসার লাভ করবে এবং ভবিষ্যত বংশধর পর্যন্ত তাদের সেই খারাপ প্রভাব বিস্তার লাভ করবে।

বিপর্যয়ের এসব পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য ইসলামী শরীয়ত পুরুষকে তালাকের অধিকার ও নারীকে খোলার অধিকার দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে যেন 'তাসরীহুম বি-ইহসান'-এর মূলনীতির ওপর আমল করতে পারে।[২৬] কিন্তু এমনও কতিপয় ঝগড়াটে প্রকৃতির লোক রয়েছে, যারা না 'ইমসাক বিল-মা'রূফ'-এর ওপর আমল করতে পারে, আর না 'তাসরীহুম বি-ইহসান'-এর ওপর আমল করতে প্রস্তুত হয়। অনন্তর দাম্পত্য পরিসরে এমনও অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যার ফলে হয় অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় অথবা 'ইমসাক বিল মারূফ' (সসম্মানে ফিরিয়ে রাখা) এবং 'তাসরীহুম বি-ইহসান' (ভদ্রভাবে বিদায় দেয়া) উভয়ের ওপর আমল করা তাদের জন্য সম্ভব হয় না। এজন্য ইসলামী শরীয়ত তালাক ও খোলার

---

২৬. এখানে একথাও হৃদয়ংগম করে নেয়া দরকার যে, ইসলামী শরীয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদকে আদালতে জনসমক্ষে নিয়ে আসা পসন্দ করে না। ইসলামী শরীয়ত এজন্য পুরুষ ও নারীর প্রয়োজনে এমন আইনগত ব্যবস্থাও রেখেছে যে, যতদূর সম্ভব ঘরের বিবাদ ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। আদালতের দরজার কড়া নাড়া হবে সর্বশেষ প্রচেষ্টা, যখন পারিবারিক পরিসরে মীমাংসায় পৌছার কোনো সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে।—গ্রন্থকার

ব্যবস্থা ছাড়াও অধিকারের সংরক্ষণ এবং আল্লাহর অধিকারসমূহের হেফাযত করার অন্য তৃতীয় একটি পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর নাম হচ্ছে শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা।

শরীয়তের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক কথা

শরীয়তী বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

বিচারের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত

শরীয়তের বিচার ব্যবস্থার শর্তগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে—আদালতকে অবশ্যই ইসলামী আদালত হতে হবে এবং বিচারককে অবশ্যই মনে প্রাণে মুসলমান হতে হবে। এর একটি কারণ তো হচ্ছে যা ফিক্‌হবিদগণ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ শরীয়তের মূলনীতির অধীনে শরীয়তী ব্যাপারসমূহে মুসলমানদের ওপর অমুসলিম বিচারকদের ফায়সালা যদিও বাহ্যত কার্যকর হয়ে যায়, কিন্তু নীতিগত দিক থেকে তা কার্যকর হতে পারে না। যেমন, এক অমুসলিম বিচারক একজন মুসলমানের বিবাহ বাতিল করে দিল, চাই তার ওই নির্দেশ শরীয়তের নির্দেশ অনুসারেই হোক না কেন এবং কার্যত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদই হোক না কেন, কিন্তু মূলত তার দ্বারা বিবাহ বাতিল ঘোষিত হলেও তা বাতিল হবে না এবং অন্যের সাথে বিবাহ বসাও স্ত্রীলোকটির জন্য জায়েয হবে না। যদি সে বিবাহ করে, তবে তার এ বিবাহ বাতিল গণ্য হবে এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তার সন্তানরা হবে অবৈধ।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কুরআন অনৈসলামী আদালতের ফায়সালাকে মূলত সমর্থনই করে না। তাছাড়া, বিশেষ করে মুসলমানদের ব্যাপারে কুরআনের চূড়ান্ত ফায়সালা হচ্ছে—তাদের সম্পর্কে কুফরী আদালতের ফায়সালা আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসংগটি আমি আমার 'একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া' নামক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি—যা এ পুস্তকের শেষদিকে পরিশিষ্ট আকারে পেশ করা হয়েছে।

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা

বিচারকের মধ্যে ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া যে আইনকে কার্যকর করার জন্য তাকে বিচারকের আসনে বসানো

হয়েছে সেই আইনের প্রতি তার অন্তরে বিশ্বাসগত দিক থেকে গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। কারণ এছাড়া যেসব বিষয়ের মীমাংসা কাযীর সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যদিও শরীয়তে এর জন্য ব্যাপক বিধান মওজুদ রয়েছে, তথাপি ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি মোকদ্দমার বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ রেখে এসব আইন-কানুনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করা, ক্ষেত্রবিশেষে আইনের মূলনীতি থেকে অগুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রয়োজনীয় নির্দেশ বের করা এবং আইনের প্রাণসত্তা অনুযায়ী মামলা পরিচালনার যাবতীয় শর্তের দিকে লক্ষ রাখা— কাযীর মধ্যে উল্লিখিত যোগ্যতার সমাবেশ না ঘটলে সম্ভব নয়। একথা সুস্পষ্ট যে, এ দুটি গুণের সমাবেশ কেবল এমন ব্যক্তির মধ্যে হওয়াই সম্ভব, যিনি ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে মুসলমান এবং ইসলামী আইনের মূলনীতি ও এর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ। তিনি এ আইনের ভাবধারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, এর মূল উৎস সম্পর্কে তিনি দক্ষ এবং অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিম সমাজের গঠন প্রণালী ও বিন্যাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। একজন অমুসলিম বিচারকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আর এজন্যই তিনি মুসলমানদের শরঈ ব্যাপারসমূহে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন বলে মোটেই আশা করা যায় না।

ভারতীয় উপমহাদেশে শরীয়তভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা না থাকার কুফল[২৭]

এ উপমহাদেশে বৃটিশ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরও ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের শরঈ ব্যাপারগুলোর ফায়সালা মুসলমান বিচারকগণই করতেন। আলেম সমাজের মধ্য থেকে তাঁদের বেছে নেয়া হতো। কিন্তু এরপর এ বিচার ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া হয় এবং সাধারণ দেওয়ানী ব্যাপারগুলোর মত শরঈ বিষয়াদিও ইংরেজ আদালতের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হয়।

এর প্রথম ক্ষতি ছিল এই যে, শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিচার ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল, তা প্রায় শেষ হয়ে গেল। এর ফলে মুসলমানদের জন্য এ আদালত থেকে নিজেদের শরঈ ব্যাপারসমূহে

---

২৭. এখানে একটি কথার ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন যে, অমুসলিম সরকারের অনুমোদনক্রমে যে শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে–মৌলিকভাবে এর যথার্থতায় আমি বিশ্বাসী নই। কিন্তু প্রসংগক্রমে আমি এখানে এমন একটি পন্থা নির্দেশ করতে চাই, যতদিন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হবে ততদিন ভারতীয় মুসলমানদের শরঈ বিষয়াদি তার ভিত্তিতে মীমাংসা করা জায়েয হতে পারে।–গ্রন্থকার

এরূপ ফায়সালা লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়লো, যাকে তাদের দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে শরঈ ফায়সালা বলা যেতে পারে।

এর দ্বিতীয় ক্ষতি, যা গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম ক্ষতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, তা ছিল—এ আদালতের বিচারকদের কাছে ইসলামী মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার ওপর ব্যাপক জ্ঞান, এ সম্পর্কে ইজতিহাদ ও গবেষণা করার সঠিক শক্তি সৃষ্টি হওয়ার মতো উপায়-উপকরণ ছিল না। আর তাদের অন্তরে এ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও ছিল না যে, তা তাদেরকে এর নির্ধারিত সীমালংঘন করা থেকে বিরত রাখতে পারতো। যেসব বই-পুস্তক ছিল তাদের জ্ঞানের উৎস, সেগুলো এমন লেখকদের রচিত যারা আরবী ভাষার সাথে অপরিচিত ছিল। যেমন হ্যামিলটন (Hamiltion), তিনি একটি ফারসী অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার ইংরেজী অনুবাদ তৈরি করেন। সঠিক অর্থে হিদায়ার মূল গ্রন্থ বুঝবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। এমনকি তিনি ফিকহের সাধারণ পরিভাষাগুলো বুঝতে এতটা ভুল করেছেন যে, মূল হিদায়ার সাথে না মেলানো পর্যন্ত তা উপলব্ধিতে আসবে না। বেইলীর '(Baillie) Digest of Muhammadan Law' যা ফতোয়া-ই আলমগীরীর সারসংক্ষেপের তরজমার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এবং ম্যাকনাটনের (Macnaughton) 'Principles of Muhammadan Law' গ্রন্থগুলোতে ইসলামী আইন সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানের দৈন্যদশার চিত্র ফুটে উঠেছে। পূর্ণাংগ জ্ঞানের অভাবে তাঁরা এসব বইয়ে আইনের ত্রুটিপূর্ণ ও সংগতিহীন ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরেজ বিচারালয় গুলো স্বয়ং নিজেদের জ্ঞানের দীনতার কথা অকপটে স্বীকার করেছে। যেমন বিচারপতি মারকবি এক মামলার রায়ে লিখেছেন ঃ

> ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য আদালতের কাছে যেসব উপায়-উপকরণ রয়েছে তা এতটা অপর্যাপ্ত ও সীমিত যে, এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে কোনো পথ সানন্দে অবলম্বন করতে আমি প্রস্তুত।[২৮]

কিন্তু এতটা সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বিচারালয়সমূহ ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা ও ইজতিহাদ করার দুঃসাহস করে এবং এর সীমালংঘন করতে মোটেই ভয় পায় না। কারণ এ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তাদের ঈমান-আকীদার অন্তরভুক্ত নয় এবং স্বৈরাচারী সরকারের বিচার বিভাগের পক্ষ থেকেও তাদের ওপর এমন কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি যে, বিচারকগণ এ আইনের সীমালংঘন করতে পারবেন না। অপর

---

২৮. খাযা হোসাইন বনাম শাহযাদী বেগম।

একটি মামলার রায়ে[২৯] প্রধান বিচারপতি গার্থ যা লিখেছেন তা এসব বিচারালয়ের সঠিক অবস্থানকে তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন ঃ

> ইসলামী আইন, যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং যা পুরাতন বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এখন থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে বাগদাদ এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে যা প্রচলিত ছিল—এসব দেশের আইনগত ও সামাজিক অবস্থা থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। যদিও আমরা মুসলমানদের মধ্যকার মামলা-মোকদ্দমায় যতদূর সম্ভব ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রথমত এটাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, মূলত আইনটি কি রকম ছিল ? দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগের মুজতাহিদ অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে অসংখ্য মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা খুবই কঠিন। তাই আমাদেরকে আইনের মূল ভিত্তি ও সঠিক মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। অতপর ইনসাফের নীতি, সৎ উদ্দেশ্য, দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং সামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ রেখে তা কার্যকর করা উচিত।

এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আদালতের একজন প্রধান বিচারপতি ইসলামী আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করছেন এবং আইনের ব্যাখ্যায় ইমামদের মতবিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করেছেন। তিনিই আবার নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছাকে প্রকাশ্যভাবে জায়েয মনে করেছেন। তিনি একটি বিচারের রায়ের মধ্যে একথা প্রকাশ করতে মোটেই দ্বিধা করছেন না যে, তিনি মুসলমানদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেবল ইসলামের আইনের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য নন, বরং এর সাথে সাথে তিনি দেশের প্রচলিত আইন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ইনসাফের মূলনীতি সম্পর্কে স্বয়ং নিজের দৃষ্টিভংগীর প্রতি লক্ষ রাখাও জরুরী মনে করেছেন। আমাদের দেশের বিচারালয়গুলোতে 'মোহামেডান ল' নামে যে ত্রুটিপূর্ণ ও পঙ্গু আইন প্রচলিত আছে, তা এ ঈমানহীন ও জ্ঞানশূন্য গবেষণার ফসল। ইসলামী আইনের নামে এ পঙ্গু আইনটিও আমাদের শরঈ ব্যাপারসমূহে যথাযথভাবে কার্যকর হয় না, বরং বিচারালয়ের নিত্য নতুন সিদ্ধান্তের কষাঘাতে তা দিন দিন আরো বিকৃত হয়ে চলেছে।

২৯. মালিক আবদুল গফুর বনাম মালীগা।

সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ

বিবাহ, তালাক ও শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা পাওয়ার জন্য বর্তমানে যদি সামান্যতম কোনো পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানদেরকে এখানে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন (Cultural Autonomy) করতে হবে।[৩০] এর অধীনে মুসলমানরা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে মীমাংসার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীয়তী আদালত প্রতিষ্ঠার অধিকারী হবে। ইসলামী আইনের ওপর ফকীহসুলভ গভীর জ্ঞানের অধিকারী মুত্তাকী ও পরহেযগার আলেমগণ এসব আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হবেন। এটা এমনই এক প্রয়োজন, যার অবর্তমানে এখানকার মুসলমানদের বাস্তবক্ষেত্রে মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করা অসম্ভব। তারা যদি এটাও অর্জন করতে না পারে তাহলে অবরোহণ পন্থায় এতটুকুই যথেষ্ট এবং এটা একান্ত দায়ঠেকা অবস্থায় যে, মালিকী মাযহাব অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি পঞ্চায়েত গঠন করা যেতে পারে। এর সদস্যদের ওপর জেলার মুসলিম জনসাধারণের সাধারণ আস্থা থাকতে হবে এবং সদস্যদের মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন নির্ভরযোগ্য আলেম হবেন। অতপর স্বৈরাচারী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এ কমিটির আইনানুগ স্বীকৃতি আদায় করতে হবে এবং মুসলমানদের বিবাহ, তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে পঞ্চায়েত যে ফায়সালা দিবে সরকার তাকে আদালতের সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিবে। ইংরেজ আদালতে এর বিরুদ্ধে কোনো আপীল করা যাবে না। এমনকি ইংরেজ আদালতে বিবাহ, তালাক ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব মোকদ্দমা দায়ের করা হবে তাও পঞ্চায়েতে স্থানান্তর করে দেয়া হবে।[৩১]

বৃটিশ ভারত ছাড়াও অমুসলিম রাজ্যে এবং যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে ইংরেজ সরকারের অনুকরণে শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে শরঈ বিষয়গুলো সাধারণ দেওয়ানী আদালতের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে—সেসব দেশে এ ব্যবস্থার পুনঃ সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম হয় শরীয়তী বিচার ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে অথবা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম করে এসব রাজ্য সরকার থেকে তার আইনানুগ স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। যদি এটা করা

---

৩০. এ বিষয়ের ওপর আমি 'মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।–গ্রন্থকার

৩১. হানাফী মাযহাবমতে পঞ্চায়েতের ফায়সালা বিচার বিভাগীয় কাযীর ফায়সালার সমকক্ষ হতে পারে না। কিন্তু যদি এ পঞ্চায়েত নিজেদের রায় বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা রাখেন এবং তাঁদের এখতিয়ার যদি সালিসের পর্যায়ে না হয়ে বরং বিচারকের সমমর্যাদায় হয়, তাহলে হানাফী মাযহাব মতেও তাঁদের ফায়সালা শরীয়তী কোর্টের কাযীর রায়ের সমকক্ষ হবে।–গ্রন্থকার

সম্ভব না হয় তাহলে আইন পরিষদে কোনো আইনের খসড়া পেশ করে তা পাশ করিয়ে নেয়া ইসলামের উদ্দেশ্যের জন্য কখনো ফলদায়ক হবে না।

আইনের একটি নতুন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা

শরীয়তী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে আরো একটি জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে। তা হচ্ছে এমন একটি আইনের বই সংকলন করা যাতে মুসলমানদের শরঈ ব্যবস্থাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আইনগত নির্দেশসমূহ (ফিক্হী আহকাম) ব্যাখ্যাসহ ক্রমিক মোহামেডান ল-এর ধারায় সাজানো থাকবে। এতে শরীআতী আদালতে অথবা পঞ্চায়েতে বর্তমান বৃটিশের পরিবর্তে এ আইনের প্রবর্তন করা সহজ হবে। মিসরে যখন মিশ্র আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেখানেও এ ধরনের একটি আইনের সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছিল, যার মধ্যে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত সমস্ত জরুরী আইন-কানুন একত্রে সংকলিত থাকবে। সুতরাং মিসর সরকারের ইংগিতে এবং কুদরী পাশার নেতৃত্বে আল-আযহারের আলেমগণের কমিটি এ কাজ আনজাম দিয়েছেন। এ কমিটি কর্তৃক প্রণীত আইনের সংকলনটিকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়ে আদালতে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।[৩২]

ভারতের এরূপ একটি কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এ কমিটির অধীনে প্রতিটি গ্রুপের নির্বাচিত আলেমগণ কয়েকজন আইনবিশারদের সাথে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ আইনের একটি বিশদ সংকলন তৈরি করবেন। প্রথমত এ সংকলনটিকে একটি খসড়ার আকারে প্রকাশ করে বিভিন্ন গ্রুপের আলেমদের অভিমত জানতে চাওয়া হবে। অতপর তাঁদের অভিমত ও পর্যালোচনাকে সামনে রেখে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। এটা যখন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করবে তখন এটাকে শরীয়তের নির্দেশাবলীর একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। অতপর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, মুসলমানদের শরঈ ব্যাপারগুলো এ সংকলনের দিকে রুজু করা হবে এবং ইংরেজ আদালতের দৃষ্টিভংগী ও জ্ঞানহীন, ঈমানশূন্য, অযোগ্য বিচারকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যে Muhammadan Law (মুহাম্মাদী আইন) প্রণীত হয়েছে সেগুলোকে বাতিল গণ্য করা হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের ফিক্হের গ্রন্থগুলোতে যখন আইনের সার্বিক দিক সবিস্তারে বর্ণিত আছে, তখন এ রকম একটি নতুন সংকলন

৩২. এ সংকলনটি ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়ে 'Droit Mussalman' নামে প্রকাশিত হয়েছে। মিসর ছাড়াও অন্যান্য দেশের আদালতসমূহ এ বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।—গ্রন্থকার

তৈরি করার কি প্রয়োজন আছে ? এ রকম আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার যে কেবল আশংকাই আছে তা নয়, বরং একটি গ্রুপের মানসিকতার দিকে লক্ষ রেখে নিশ্চিত বলা যায়, এ প্রস্তাবের অবশ্যই বিরোধিতা করা হবে। অতএব যেসব কারণে এরূপ একটি পূর্ণাংগ সংকলন তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমি এখানে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করবো।

ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখলেও যে কোনো ব্যক্তি এটা বুঝতে সক্ষম যে, ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে ইসলামী আইন-কানুন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলো প্রাচীন বর্ণনাভংগী ও পদ্ধতিতে লিখিত। বর্তমানে যেসব লোক এসব কিতাব পড়ান তাঁরাও সাধারণত এর পারিভাষিক সূক্ষ্মতা উত্তমরূপে বুঝতে অক্ষম। আজকাল আইনের বইগুলোতে আইনের ধারাসমূহ ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, প্রতিটি ধারার নীচে বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা, এর উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ, এর অধীনে আগত উপধারাসমূহ বিশদ-ভাবে বর্ণনা করা হয়। এতে বিভিন্ন বিচারকের দৃষ্টিভংগী—নির্ভরযোগ্য বিচারকদের দৃষ্টিভংগী, বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যাসমূহ এবং বিভিন্ন মোকদ্দমার রায়ও সন্নিবেশিত থাকে। উপরন্তু সূচীপত্র, বিষয়সূচী (Index) সংযোজন করে পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়সমূহ খুঁজে বের করা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এগুলো দেখে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা মেনে নিতে অস্বীকার করবে না যে, মানবীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে প্রকাশনা শিল্পের বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই যে উন্নতি সাধিত হয়েছে—ফিক্‌হের কিতাবসমূহের পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ নতুন বিন্যাস পদ্ধতিকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। পরিশেষে যে প্রাচীন পদ্ধতিতে ফিকহের কিতাবগুলো সাজানো হয়েছে তা তো আর আসমানী নির্দেশের মাধ্যমে অনুমোদিত নয় যে, এ পদ্ধতির অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক এবং এটা পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ।

কিন্তু এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, পুরাতন ফিকহের গ্রন্থসমূহে যতগুলো নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানবীয় পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। এ নির্দেশগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং নির্বিচারে প্রতিটি ব্যাপারে প্রয়োগ করা মূলত ভুল। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে এর সার্বিক পর্যালোচনা করতে হবে ঃ

এক ঃ যে ইসলামী সমাজে এ আইন কার্যকর করা হচ্ছে, তার নৈতিক, তামদ্দুনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এটাও দেখতে হবে যে, এ সমাজের সামগ্রিক অভ্যাস, প্রকৃতি ও রসম-রেওয়াজ কি ধরনের ? তারা কিরূপ পরিবেশে বসবাস করে, তাদের ওপর

এ পরিবেশের কি কি প্রভাব রয়েছে এবং তাদের বাস্তব স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও কার্যক্রমে ইসলামের প্রভাব কতটা শক্তিশালী অথবা দুর্বল ? বাইরের প্রভাবে তাদের ইসলামী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা ও পরিবেশ যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে আইনগত দিক থেকে কি ধরনের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়েছে ?

দুই ঃ প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকের বিশেষ অবস্থার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাদী-বিবাদীর স্বভাব-চরিত্র, বয়স, শিক্ষা, দৈহিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক পজিশন, অতীত ইতিহাস, বংশীয় রীতিনীতি এবং তাদের স্তরের সাধারণ অবস্থা—এসব কিছুর প্রতি দৃষ্টি রেখে রায় গঠন করতে হবে। কোনো বিশেষ আনুষংগিক ব্যাপারে তাদের ওপর কিভাবে আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে—যাতে আইনের উদ্দেশ্যও যথাযথ-ভাবে পূর্ণ হতে পারে এবং আইনের মূলনীতি থেকেও বিচ্যুতি না ঘটে।

এ দুটি দিককে উপেক্ষা করে যদি কেউ ফিক্‌হের কোনো পুরাতন কিতাব থেকে একটি আনুষংগিক নির্দেশ বের করে চক্ষু বন্ধ করে তা যে কোনো মোকদ্দমায় সমানভাবে প্রয়োগ করতে থাকে যার সাথে এ আনুষংগিক নির্দেশের মিল রয়েছে—তাহলে এমন একজন ডাক্তারের সাথেই তার তুলনা করা যায় যিনি বুকরাত[৩৩] এবং জালীনূসের[৩৪] লেখা বই নিয়ে বসে গেলেন এবং দেশের আবহাওয়া, ঋতু, প্রত্যেক রোগীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন রোগের পৃথক পৃথক ধরন ও উপসর্গ ইত্যাদি থেকে চক্ষু বন্ধ করে এ বইয়ের ওপর ভিত্তি করেই ব্যবস্থাপত্র দিতে শুরু করলেন।

প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের রচিত এ পুস্তক নিজ স্থানে যথার্থই সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু মূর্খ ঔষধ বিক্রেতাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তা কবে রচিত হয়েছে ? এসব পুস্তক এ কাজে লাগানোর জন্যও বুদ্ধি-জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কৌশল ও বোধশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে মুজতাহিদ ইমামগণ ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি ও মৌলিক আইন থেকে

---

৩৩. 'হিপ্পোক্রাটস' খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকের বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি Hippocrates the Great নামে পরিচিত। তাঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।–অনুবাদক

৩৪. 'গ্যালেন' আনুমানিক ১২৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান তুরস্কের বিরগামা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে হিপ্পোক্রাটসের পরে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি একাধারে ডাক্তার, দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন।–অনুবাদক

যেসব আনুষংগিক আইন বের করছেন তাও স্বস্থানে যথার্থই সঠিক ও নির্ভুল। কিন্তু এ ইজতিহাদ ও গবেষণালব্ধ আইনগুলোকে জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা ছাড়াই ডাকপিয়নের ডাকে আসা সব চিঠির ওপর নির্বিচারে একই রকম সীলমোহর করার ন্যায় যথেষ্ট ব্যবহার করা হবে— এ মহান মুজতাহিদগণ তা কখনো কল্পনা করেননি।

ইসলামী আইন এমন যুক্তিসংগত মূলনীতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল যে, তার অধীনে কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের বাধ্য হয়ে চরিত্রহীন কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা সমাজের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে পরিণত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। আর এ আইনের কঠোরতার কারণে বাধ্য হয়ে কোনো মুসলমান পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের ইসলামের সীমারেখা থেকে সরে পড়াটা তো ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু আজ আমরা দেখছি মুসলমানদের মধ্যে কেবল অসংখ্য পারিবারিক ঝগড়াই সৃষ্টি হচ্ছে না, বরং কঠিন নৈতিক বিপর্যয়, এমনকি ধর্ম ত্যাগের ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে। এ ধরনের বিপর্যয় কেবল এজন্য ছড়িয়ে পড়েছে যে, অধিকাংশ মামলায় ইসলামী আইনের অধীনে লোকদের জন্য সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা হাসিল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বুদ্ধি-বিবেক, গভীর জ্ঞান, চিন্তা-দূরদর্শিতা না মুফতীদের মধ্যে বর্তমান আছে আর না আদালতের বিচারকদের মধ্যে। তাঁদের কেউ লক্ষ করেন না, আমরা একটি সাধারণ নির্দেশকে যে দেশে, যে সমাজে এবং যে বিশেষ মামলায় কার্যকর করছি এর কোন কোন্ বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে তা এ নির্দেশের সাধারণ সীমার মধ্যে শরীয়তের মূলনীতির অধীনে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, যাতে শরীয়তের কোনো একটি উদ্দেশ্যও ব্যাহত হতে না পারে এবং এর কোনো একটি মূলনীতির বিরোধিতারও প্রয়োজন না হয়। আদালতের বিচারকদের সম্পর্কে যতদূর বলা যায়— তাঁদের অক্ষমতা তো সুস্পষ্ট। বাকি থাকলেন আলেম সমাজ। তাদের মধ্যে একদলের অবস্থা এই যে, পুরাতন ফিক্‌হের গ্রন্থগুলোতে আনুষংগিক নির্দেশগুলো যেভাবে লিখিত আছে সেগুলোকে অবিকল পেশ করার চেয়ে অধিক যোগ্যতা তাঁদের মধ্যে নেই। আর কতিপয় আলেমকে যদিও আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টির প্রশস্ততা এবং দীনের গভীর জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু এককভাবে তাঁদের কারো মধ্যে এতটুকু দুঃসাহস নেই যে, কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কোনো পুরাতন আনুষংগিক নির্দেশ থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হন। কেননা একদিকে তাঁরা ভুলে নিমজ্জিত হওয়ার ভয়ে এ দুঃসাহিসক পথে পা বাড়ান না। অপরদিকে তাঁদের ভয় হচ্ছে অপরাপর আলেমগণ তাঁদেরকে মাযহাবের অন্ধ অনুকরণ থেকে বিচ্যুত

হওয়ার অপবাদ দিবেন। এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে, প্রতিটি প্রদেশের প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী আলেমদের একটি দল এ কাজকে নিজেদের হাতে তুলে নেবেন। তাঁরা নিজেদের সম্মিলিত শক্তি ও প্রভাব কাজে খাটিয়ে শরঈ বিষয়গুলোর জন্য এমন একটি আইন কাঠামো প্রণয়ন করবেন, যা ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এগুলো এতটা নমনীয় হবে যে, কোনো বিচ্ছিন্ন পরিস্থিতিতে আইনের মূলনীতির অধীনে আনুষংগিক নির্দেশের মধ্যে যেন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্ভব হয়।

কোনো ব্যক্তি যদি এটাকে তাকলীদের পরিপন্থী সাব্যস্ত করে, তাহলে আমরা বলবো, সে ভুলের মধ্যে আছে। মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) এবং নবী-রসূলদের তাকলীদের মধ্যে যে কি ধরনের পার্থক্য হওয়া উচিত তাই সে জানে না। জাহেল-মূর্খ লোকের তাকলীদ ও সুযোগ্য আলেমের তাকলীদের মধ্যে যে কি পার্থক্য হওয়া উচিত তাও সে জানে না। সে এতটুকুও অবহিত নয় যে, কোনো ফিক্হভিত্তিক মাযহাবের অনুসরণ করার অর্থ কি? সে তাকলীদের অর্থ এই মনে করে, "নিজের ফিকহী মাযহাবকে দীনের স্থলাভিষিক্ত এবং এই মাযহাবের ইমামকে নবীর স্থলাভিষিক্ত মনে করতে হবে। এ মাযহাবের মাসয়ালা-মাসায়েলকে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশের মত অকাট্য মনে করতে হবে। আকীদা হিসাবে একথা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, এ মাযহাবের কোনো মাসয়ালার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তো দূরের কথা, এর বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করাও কঠিন গুনাহের কাজ। কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে এ মাযহাবের কোনো আনুষংগিক নির্দেশ পরিত্যাগ করা ইজতিহাদ ও গবেষণার যুগ অর্থাৎ চতুর্থ হিজরী শতক পর্যন্তই জায়েয ছিল, কিন্তু এরপর তা হারাম হয়ে গেছে।"

কিন্তু এ ধরনের তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণ পূর্বকালের আলেমদের কারো দ্বারাই প্রমাণিত নয়। আর না এর সমর্থনে কোনো শরঈ প্রমাণ কোথাও থেকে পাওয়া যেতে পারে। ইমাম আযম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহ আলাইহির ছাত্রগণ হাজারো মাসয়ালায় নিজেদের ইমামের সাথে মতভেদ করেছেন। এ সত্ত্বেও তাঁরা হানাফী মাযহাব থেকে বহিষ্কৃত হননি। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ইমাম আযম র. ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে কতককে কতকের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং একজনের মত পরিত্যাগ করে অন্যজনের মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এরূপ পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই করা সত্ত্বেও কেউ তাঁদের অ-মুকাল্লিদ বলতে পারেনি। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে শুরু করে অষ্টম থেকে নবম হিজরী শতকের হানাফী

আলেমগণ তাদের পূর্ববর্তীদের ইজতিহাদী মাসয়ালার ক্ষেত্রে যুগের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে থাকেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অপরাপর মুজতাহিদ ইমামদের মাযহাবের মত গ্রহণ করে তদনুযায়ী ফতোয়া দিতে থাকেন। কিন্তু কেউই তাঁদের এ ইজতিহাদের ওপর অ-মুকাল্লিদের হুকুম লাগাননি। কারো এতটা দুঃসাহস নেই যে, আবুল লাইস সামারকান্দী, শামসুল আইম্মা সারাখসী, হিদায়ার সংকলক, কাযীখান, কানযুল উম্মালের রচয়িতা, আল্লামা শামী এবং এ পর্যায়ের অপরাপর আলেমদের অ-মুকাল্লিদ বলে দোষারোপ করবে। কারণ তাঁরা হানাফী মাযহাবের মাসয়ালায় নিজ নিজ যুগের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নমনীয়তা সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব ব্যাপারে এ মাযহাবের কোনো নির্দেশকে ক্ষতিকর অথবা সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করে কার্যকর করার অনুপযোগী পেয়েছেন সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবের মাসয়ালা অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁরা এটাকে হানাফী মাযহাবের মূলনীতির অন্তরভুক্ত করে নিয়েছেন, 'প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে, এর মধ্যে যেন কুপ্রবৃত্তি স্থান না পায়।'

এতে সন্দেহ নেই যে, লোকেরা যদি বলগাহীনভাবে নিজ নিজ প্রয়োজন মোতাবেক অন্য মাযহাব অনুযায়ী আমল করার অথবা নিজ মাযহাবের অবকাশের (Option) সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তাহলে তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। বিভিন্ন মাযহাব নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব অনুমতি দিয়েছে তা থেকে অবৈধ ফায়দা ওঠানোর ও দীনের সাথে উপহাস করার দরজা খুলে যাবে এবং আচার-আচরণে কঠিন বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। কিন্তু দীনের আলেমগণ যদি তাকওয়া ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের প্রয়োজন ও অবস্থার দিকে লক্ষ রেখে এটা করতে যান তাহলে এর দ্বারা দীনী অথবা পার্থিব কোনো ক্ষতির আশংকা নেই, বরং কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে যদি তাঁরা অজ্ঞাতসারে কোনো ভুলও করে বসেন তাহলে ইসলামী শরীয়তের উৎসদ্বয় (নস) পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তাআলা এজন্য তাঁদের ক্ষমা করবেন এবং তাঁদের সৎ উদ্দেশ্যের পুরস্কার দান করবেন।

এ পন্থা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে খুব বেশী হলে এতটুকু আশংকা আছে যে, একদল লোক তাদের বিরোধিতা করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যাবে এবং তাঁদের অনুসারীদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক লোক তাঁদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। কিন্তু এ পন্থা অবলম্বন না করার মধ্যে এর চেয়েও যে বড়

আশংকা রয়েছে, তা হচ্ছে—মুসলমানরা যখন নিজেদের প্রয়োজনের সামনে অসহায় হয়ে ইসলামী আইনের পরিবর্তে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে এবং তাদের মধ্যে দীনকে নিয়ে উপহাস করা, শরীয়তের আইনকে খেলনায় পরিণত করা, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার বিরুদ্ধাচরণ করা, দীনী ও নৈতিক বিপর্যয়, কুফর ও আল্লাহদ্রোহী কাজের মহামারী ছড়িয়ে পড়বে এবং খৃস্টান জাতির ন্যায় তারাও নিজেদের ধর্মের আইন পরিত্যাগ করে মানুষের মনগড়া আইন গ্রহণ করবে,[৩৫] তখন কিয়ামতের দিন এসব গুনাহ্গারদের সাথে তাদের ধর্মীয় নেতারাও গ্রেফতার হয়ে আল্লাহর আদালতে হাযির হবেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'আমি কি তোমাদের এজন্যই জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম যে, তোমরা তা কাজে লাগাবে না ? আমার কিতাব ও আমার নবীর সুন্নাত কি তোমাদের সামনে এজন্যই রাখা হয়েছিল যে, তোমরা এগুলো নিয়ে বসে থাকবে আর মুসলমানরা পথভ্রষ্ট হতে থাকবে ? আমি আমার দীনকে সহজ বানিয়েছিলাম, তাকে কঠিন করে তোলার তোমাদের কি অধিকার ছিল ? আমি তোমাদেরকে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছিলাম। এ দু'জনকে অতিক্রম করে নিজেদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করা তোমাদের ওপর কে ফরয করেছিল ? আমি প্রতিটি কাঠিন্যের প্রতিষেধক এ কুরআনে রেখে দিয়েছিলাম, এটাকে স্পর্শ করতে তোমাদের কে নিষেধ করেছে ? মানুষের লেখা কিতাবগুলোকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করার নির্দেশই বা তোমাদের কে দিয়েছে ?' এ জিজ্ঞাসার জবাবে কোনো আলেমেরই কান্‌যুদ-দাকায়েক, হিদায়া ও আলমগীরীর রচয়িতাদের কোলে আশ্রয় পাওয়ার আশা নেই।

এ প্রাসংগিক আলোচনাটি যেহেতু প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া অত্যাবশ্যকীয় ছিল, তাই এটাকে এতখানি জায়গা দিতে হয়েছে। এরপর আমি আমার মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

❐

৩৫. যেমন তুরস্কে গ্রহণ করা হয়েছে।–গ্রন্থকার

মৌলিক পথনির্দেশ

কুরআন মজীদ যেহেতু একখানা মৌলিকগ্রন্থ, তাই এতে দাম্পত্য জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি। কিন্তু তাতে এমন কতগুলো ব্যাপক মূলনীতি দেয়া হয়েছে, যার অধীনে প্রায় সমস্ত প্রাসংগিক মাসয়ালাই এসে যায় এবং আনুষংগিক মাসয়ালা বের করার ক্ষেত্রেও তা উত্তমরূপে পথপ্রদর্শন করে। সুতরাং আইনের বিস্তারিত বিবরণের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরআন মজীদে বর্ণিত মূলনীতি ও নিয়মাবলী উত্তমরূপে বুঝে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

(১)

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط - البقرة : ٢٢١

"মুশরিক নারীরা যতক্ষণ ঈমান না আনবে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২১

وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط - البقرة : ٢٢١

"মুশরিক পুরুষরা যতক্ষণ ঈমান না আনবে, তোমরা তাদের সাথে তোমাদের মহিলাদের বিবাহ দিও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২১

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ -

"আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সতী-সাধ্বী নারীদের বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫

এসব আয়াতে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ হতে পারে না। অবশ্য আহলে কিতাব নারীদের তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান নারী না মুশরিক পুরুষের সাথে বিবাহ বসতে পারবে, আর না আহলে কিতাব পুরুষের সাথে।

(২)

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ .... وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ - البقرة : ٢٢١

"তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না। .... মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমাদের নারীদের বিবাহ দিও না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২১

এ আয়াত থেকে আরো একটি মূলনীতি পাওয়া যায়। পুরুষ লোক নিজেই নিজের বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। তাকে কারো সাথে বিবাহ দেয়া তার অভিভাবকদের দায়িত্ব। এতে সন্দেহ নেই যে, বিবাহের ব্যাপারে নারীদের সম্মতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তার মরযীর বিরুদ্ধে তাকে কারো কাছে বিবাহ দেয়ার অধিকার কারো নেই। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ

اَلاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِّيِّهَا ـ

"বিধবা নারী তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অভিভাবকের চেয়ে অধিক ক্ষমতা রাখে।"

لاَ تُنْكِحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ ـ

"প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না।"

কিন্তু নারীর বিবাহের ব্যাপারটা যেহেতু বংশের স্বার্থের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত, তাই কুরআন মজীদের দাবি হচ্ছে—বিবাহের ব্যাপারে কেবল নারীর পসন্দ ও ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, বরং সাথে সাথে তার পুরুষ আত্মীয়দের মতামতও বিবেচনা করতে হবে।

(৩)

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ـ

"তোমরা তাদের কাছ থেকে যে ফায়দা উঠিয়েছো তার বিনিময়ে মোহরানা প্রদান করো—এটাকে ফরয মনে করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ ـ

"তোমরা নিজেদের দেয়া মোহরানা কি করে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারো ? অথচ তোমাদের একজন অপরজনের কাছ থেকে যৌনস্বাদ লাভ করেছ।"–সূরা আন নিসা ঃ ২১

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ـ البقرة : ٢٣٧

"তোমরা যদি তাদের সাথে সহবাস করার পূর্বে এবং মোহরানা নির্ধারণ করার পরে তাদের তালাক দাও, তাহলে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পরিমাণ আদায় করতে হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

এসব আয়াত থেকে জানা যায়, পুরুষ তার স্ত্রীর নৈকট্য লাভ করে যে ফায়দা (যৌনস্বাদ) অর্জন করে—মোহরানা তারই প্রতিদান। সুতরাং নৈকট্য লাভের পরই পূর্ণ মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব হয় এবং কোনো অবস্থায়ই তা বাতিল বা রহিত হতে পারে না। কিন্তু স্ত্রী যদি সন্তুষ্টি সহকারে পূর্ণ মোহরানা অথবা তার অংশবিশেষ মাফ করে দেয়, তবে ভিন্ন কথা।

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا - النساء : ٤

"তারা যদি খুশিমনে মোহরানার অংশবিশেষ তোমাদের ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা সানন্দে গ্রহণ করতে পারো।"–সূরা আন নিসা ঃ ৪

অথবা যদি খোলার বিনিময় হিসাবে তা ছেড়ে দেয়—তাহলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط - البقرة : ٢٢٩

"স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাহলে এতে কোনো দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

(৪)

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط - النساء : ٢٠

"তোমরা যদি তাদেরকে মোহরানা হিসাবে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাকো তবে তার কিছু অংশও ফেরত নিতে পারো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ২০

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ইসলামী শরীয়তে মোহরানার কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। অতএব মনগড়া আইন তৈরি করে পরিমাণ সীমিত করা যায় না।

(৫)

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط - النساء : ٣٤

"পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। কারণ আল্লাহ তাদের এক দলকে অপর দলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষরা তাদের জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এ আয়াতের দৃষ্টিতে নারীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বা তার ব্যয়ভার বহন করা পুরুষের ওপর ওয়াজিব। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে পুরুষ নারীর

ওপর স্বামীত্বের যে অধিকার অর্জন করে—এটা তারই বিনিময়। নারীর খোরপোষ পাওয়ার এ অধিকার কোনো অবস্থাতেই বাতিল হতে পারে না। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় তার এ অধিকার ছেড়ে দেয় অথবা সে যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায়—তাহলে স্বতন্ত্র কথা।

(৬)

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ ط

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী (স্ত্রীর) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে এবং যে ব্যক্তি অসচ্ছল—তাকে আল্লাহ্ যে পরিমাণ রিযিক দিয়েছেন তদনুযায়ী (স্ত্রীর) খোরপোষ দিবে।"–সূরা তালাক ঃ ৭

এখানে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার সম্পর্কে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এর পরিমাণ নির্ধারণের সময় স্বামীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। সম্পদশালী ব্যক্তির ওপর তার সচ্ছলতা অনুযায়ী এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে এবং গরীব ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী এর পরিমাণ ধার্য হবে।

(৭)

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط ـ النساء : ٣٤

"তোমরা যেসব স্ত্রীদের বিদ্রোহী হওয়ার আশংকা করো, তাদেরকে উপদেশ দাও, বিছানায় তাদের থেকে পৃথক থাকো এবং তাদেরকে দৈহিক শাস্তি দাও। অতপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য কোনো পথ খুঁজবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, স্ত্রী যখন বিদ্রোহাত্মক মনোভাব এবং আনুগত্যহীনতার পথ গ্রহণ করে, কেবল তখনই তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার স্বামীকে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায়ও শাস্তির দুটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ বিছানা ত্যাগ অর্থাৎ সহবাস পরিত্যাগ করা।

দুই ঃ হালকা মারপিট, যা চরম বিদ্রোহী হয়ে পড়লেই কেবল জায়েয।

এ সীমালংঘন করা অর্থাৎ বিদ্রোহী না হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি দেয়া অথবা সাধারণ পর্যায়ের বিদ্রোহের কারণে গুরুদণ্ড দেয়া অথবা চরম বিদ্রোহের ক্ষেত্রে হালকা মারপিটের সীমালংঘন করা ইত্যাদি সবই যুলুম ও বাড়বাড়ির অন্তরভুক্ত।

(৮)

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط ـ النساء : ٣٥

"তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাও। তারা যদি সংশোধনের ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য সৃষ্টি করে দিবেন।"

—সূরা আন নিসা ঃ ৩৫

উল্লিখিত আয়াতে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি ঝগড়া-বিবাদ হয়ে যায় এবং নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেয়ার কোনো পথ সৃষ্টি না হয়, তাহলে তাদের এ বিবাদ মীমাংসার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পূর্বে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন এবং স্ত্রীলোকটির আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা উচিত। তারা উভয়ে মিলে এদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করার চেষ্টা করবে।

'ওয়া ইন খিফ্তুম' ও 'ফাব'আসু' বাক্যাংশের দ্বারা মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এজন্য সালিস নিযুক্ত করা তাদের কাজ। সালিসগণ যদি কোনো মীমাংসা করতে না পারেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করার ক্ষমতা মুসলমানদের কর্তা ব্যক্তিই (উলিল আমর) লাভ করবেন।

(৯)

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ـ

"তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে

বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তাতে উভয়ের কোনো দোষ নেই।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফায়সালা করার সময় কাযীকে যে বিষয়টি সবচেয়ে অধিক বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে—স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ওপর টিকে থাকতে পারবে কি না ? যদি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ভেঙে যাওয়ার প্রবল আশংকা হয়, তাহলে এর চেয়ে অধিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নেই যার কারণে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে থাকার সিদ্ধান্ত জায়েয হতে পারে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাযত করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য প্রয়োজন হলে সবকিছুই কুরবানী করা যেতে পারে।

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - البقرة : ٢٢٩

"যেসব লোক আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, তারা যালিম।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

(১০)

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا - البقرة : ٢٣١

"তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কষ্টের মধ্যে আটকে রেখো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১

এ আয়াতে ইসলামী আইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। তা হচ্ছে—কোনো স্ত্রীলোককে কোনো পুরুষের বিবাহ-বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না যা তার ক্ষতির কারণ হবে এবং তার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি একত্রে বসবাস করতে হয় তাহলে তা ন্যায়সংগতভাবেই হতে হবে।

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

"স্ত্রীদের সাথে ন্যায়নুগভাবে বসবাস করো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯

যদি স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে হয় তাহলে সেটাও ন্যায়সংগতভাবে হতে হবে। فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ "ন্যায়সংগতভাবেই স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২০

কিন্তু যেখানে এসবের কোনো আশা নেই, বরং এর বিপরীত ক্ষতি ও অধিকার হরণের আশংকা রয়েছে—সেখানে 'তাসরীহুম বি-ইহসান'

(ভদ্রভাবে বিদায় দেয়া)-র ওপর আমল করাই জরুরী। কেননা নবী আলাইহিস সালামের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী আইনের মধ্যে কোনো ক্ষতিকর উপাদানও নেই এবং তা কারো ক্ষতি করার অনুমতিও দেয় না।

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِى الاِسْلاَمِ -

"ইসলামে ক্ষতিকর কিছু নেই এবং ক্ষতি করার সুযোগও নেই।"

(১১)

فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ - النساء : ١٢٩

"তোমরা এক স্ত্রীর প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, অন্য স্ত্রীরা ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর শেষ অংশে একটি সাধারণ নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা এই যে, কোনো স্ত্রীলোককে এমন অবস্থায় রেখে দেয়া যাবে না যে, সে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে অথচ সে তার সংসর্গ লাভ করারও সুযোগ পাচ্ছে না, আবার অপর কারো সাথে বিবাহ বসার স্বাধীনতাও পাচ্ছে না।

(১২)

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ - البقرة : ٢٢٦

"যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের ঈলা করে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ আছে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৬

এ আয়াতে মহিলাদের ভারসাম্যপূর্ণ ধৈর্য শক্তির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে চার মাস পর্যন্ত কোনোরূপ যন্ত্রণা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন ছাড়া স্বামীর সহবাস থেকে বঞ্চিত রাখা যেতে পারে।[৩৬] এরপর দুটি জিনিসের মধ্যে কোনো একটির আশংকা রয়েছে। এ আয়াতও একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এ বিশেষ ঘটনা ছাড়াও এ আয়াত অন্যান্য ব্যাপারেও পথনির্দেশ দান করে।

---

৩৬. এ নীতির ভিত্তিতে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোনো বিবাহিত ব্যক্তিকে একাধারে চার মাসের অধিক সময় সামরিক কাজে নিয়োজিত রেখে বাড়ি থেকে দূরে রাখা যাবে না।–গ্রন্থকার

(১৩)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ -

"যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষী তারা হাযির করতে পারছে না।"-সূরা আন নূর ঃ ৬

এ আয়াতে লি'আনের নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ আনে এবং কোনো সাক্ষ-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তাহলে চারবার এই বলে তাকে শপথ করানো হবে যে, সে যে অভিযোগ এনেছে তা সত্য। পঞ্চমবারে তাকে এভাবে বলানো হবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত নিপতিত হোক। এরপর স্ত্রীর যেনার শাস্তি থেকে বাঁচার একটি পথই আছে। সেও আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার বলবে যে, তার স্বামীর উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। পঞ্চমবারে সে বলবে, যদি তার স্বামীর অভিযোগ সত্য হয় তবে তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হোক। এভাবে লি'আন করা শেষ হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে।

(১৪)

اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط - البقرة : ٢٣٧

"কিন্তু স্ত্রীলোকটি নিজেই যদি অনুগ্রহ দেখায় (মোহরানা গ্রহণ না করে) অথবা যে পুরুষ লোকটির হাতে বিবাহের বন্ধন রয়েছে সে যদি অনুগ্রহ করে (পূর্ণ মোহরানা দেয়) তবে তা স্বতন্ত্র কথা।"

-সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৭

উক্ত আয়াতের শেষাংশে এ নীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বিবাহ বন্ধনের গিট পুরুষের হাতে রয়েছে এবং সে তা বেঁধে রাখার অথবা খুলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কুরআন মজীদের যেখানেই তালাকের প্রসংগ এসেছে সেখানেই 'পুংলিঙ্গের ক্রিয়াপদ' ব্যবহার করা হয়েছে এবং তালাক ক্রিয়াকে পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ (তারা যদি তালাক দেয়।-সূরা আল বাকারা ঃ ২২৭)। فَاِنْ طَلَّقَهَا (সে যদি তাকে তালাক দেয়।-সূরা আল বাকারা ২৩০) এবং اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "যখন তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দাত গণনা করার জন্য তালাক দাও।"-সূরা তালাক ঃ ১

উপরোক্ত আয়াতগুলো একথাই প্রমাণিত করে যে, পুরুষ লোকটি স্বামী হওয়ার অধিকারবলে তালাক দেয়া বা না দেয়ার পূর্ণ এখতিয়ার রাখে। তার এ অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার মত আইন তৈরি করা যেতে পারে না।

কিন্তু ইসলামে প্রতিটি অধিকারের ওপর এ শর্ত আরোপ করে রাখা হয়েছে যে, তা ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে গিয়ে যেন যুলুমের আশ্রয় না নেয়া হয় এবং আল্লাহর সীমা লংঘিত না হয়। وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ (যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে সে নিজের ওপরই যুলুম করে–সূরা তালাক ঃ ১)। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে সে নিজেকে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উপযুক্ত বানায়।

لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (তোমরাও যুলুম করো না এবং তোমাদের ওপরও যুলুম করা হবে না–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৯)। এটা একটা সাধারণ নীতি যা ইসলামী আইনের প্রতিটি বিভাগে, প্রতিটি ব্যাপারে চালু রয়েছে এবং পুরুষের তালাকের অধিকারও এর ব্যতিক্রম নয়।

অতএব যখন কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে যুলুম-নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা যথারীতি فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ [তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ ও রসূলের (বিধানের দিকে) রুজু করো–সূরা আন নিসা ৫৯] আয়াতের আওতায় আসবে এবং স্ত্রীর তার অভিযোগ যথার্থ প্রমাণিত হলে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তির এ অধিকার রয়েছে যে, সে স্বামীকে তার এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত করে তা নিজ হাতে প্রয়োগ করবে। ইসলামী শরীয়তে কাযীকে বিবাহ বাতিল করার, স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার এবং তালাক দেয়ার[৩৭] যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা এ মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল। ফিক্‌হবিদদের এক দল بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ আয়াত থেকে এ দলীল গ্রহণ করেছেন, "পুরুষকে তালাকের যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়নি এবং এ নীতির মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নেই। পুরুষ লোকটি যদি তালাক দিতে রাযী না হয়, তাহলে কোনো অবস্থায়ই কাযীর অধিকার নেই যে, স্বামীর হাত থেকে তালাকের এখতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে সে নিজে তা ব্যবহার করবে।" কিন্তু কুরআন

---

৩৭. তালাকের অধিকার স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বয়ং (কাযী তাঁর পদাধিকারবলে) স্ত্রীলোকটিকে তালাক দেয়া।–গ্রন্থকার

মজীদ এ দলীলের সমর্থন করে না। কুরআন মজীদে তো মানুষের বেঁচে থাকার মত সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারই إِلَّا بِالْحَقِّ শব্দের দ্বারা শর্তসাপেক্ষ করে দেয়া হয়েছে। আর কোথায় তার তালাকের অধিকার! স্বামী যদি যুলুমও করে, আল্লাহর যাবতীয় সীমালংঘনও করে এবং অপর পক্ষের যাবতীয় অধিকার খর্বও করে—তারপরও স্বামীর তালাকের অধিকারকে অবাধ ও শর্তহীন বলে মেনে নিতে হবে এবং তা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে—এরূপ কথাই অবান্তর।

(১৫)

اَلطَّلاَقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط ـ

"তালাক দুইবার ; অতপর হয় স্ত্রীকে ন্যায়সংগতভাবে ফিরিয়ে রাখবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় দিবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ـ

"অতপর স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহলে এ স্ত্রীলোকটির যতক্ষণ অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ না হবে ততক্ষণ সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩০

এ আয়াতে তালাকের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, দুই তালাক পর্যন্ত প্রত্যাহারযোগ্য এবং তৃতীয়বার তালাক হচ্ছে মুগাল্লাযা (বৈবাহিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নকারী) তালাক।

❐

প্রাসংগিক আলোচ্য বিষয়সমূহ

পূর্বের অধ্যায়ে মৌলিক নির্দেশসমূহ যেভাবে ক্রমিক ধারা অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে, এখন আমরা এ মৌলিক বিধানগুলোর প্রতিটির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিধানগুলোও একইভাবে ক্রমিক ধারা অনুযায়ী বর্ণনা করবো। এখানে আমরা সমস্ত প্রাসংগিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চাই না, বরং যুগের প্রয়োজন ও অবস্থার বিচারে যেসব মাসয়ালার ক্ষেত্রে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে, আমরা সেসব বিষয়ের বিশেষ ফিকহী নির্দেশগুলো বর্ণনা করবো।

১. স্বামী-স্ত্রী যে কোনো একজনের ধর্মচ্যুতি

বর্তমান সময়ে ধর্মচ্যুতির সমস্যাটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের ধর্মচ্যুতির ক্ষেত্রে তেমন কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না। কেননা কোনো মুসলিম নারী কোনো অমুসলিম ব্যক্তির বিবাহাধীনে থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু নারীদের ধর্মচ্যুতির ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহু স্ত্রীলোকই কেবল যালিম অথবা অমনোপূত স্বামীর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। এ সমস্যার ক্ষেত্রে ইংরেজ বিচারালয়গুলো ইমাম আবু হানীফা র. থেকে হিদায়া ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত প্রকাশ্য বক্তব্য অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করে থাকে। অর্থাৎ

اِذَا ارْتَدَّ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ـ

"স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কেউ মুরতাদ হয়ে গেলে তালাক ছাড়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।"[৩৮]

কিন্তু ভারতীয় আলেমগণ এ ধরনের ধর্মচ্যুতির গতিরোধ করার জন্য বলখ ও সামারকান্দের বিশেষজ্ঞদের এবং বোখারার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করতে চান। তার সারসংক্ষেপ এই যে, স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেলে বিবাহ বাতিল হয় না, বরং সে তার মুসলিম স্বামীর বিবাহ বন্ধনেই আবদ্ধ থেকে যায়। উক্ত ফতোয়ার ভিত্তি এই যে, এ ধরনের স্ত্রীলোক যেহেতু বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্যই কেবল

৩৮. অর্থাৎ সেই স্ত্রীলোক তার মুসলমান স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়, কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে সে অন্য লোকের কাছে বিবাহ বসার অধিকার লাভ করতে পারে না।–গ্রন্থকার

মুরতাদ হয়—তাই এ ছল-চাতুরীর পথ বন্ধ করার জন্য বিবাহের ওপর তার ধর্মচ্যুতির কোনো প্রভাব স্বীকার করা হবে না। কিন্তু এ ফতোয়া গ্রহণ করতে কতগুলো অসুবিধা আছে। আলেমদের দৃষ্টি সম্ভবত এখনো সেদিকে যায়নি।

প্রথম ঃ ইসলাম ও কুফরের ব্যাপারে দেশের প্রচলিত আইন এবং ইসলামী শরীয়ত উভয়ই কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই গ্রহণ করে থাকে। আমাদের কাছেও এমন কোনো উপায় নেই যার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, স্ত্রীলোকটি অন্তরের দিক থেকে ধর্মত্যাগী হয়নি, বরং সে কেবল স্বামীর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুরতাদ হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ যে স্ত্রীলোক আসমানী কিতাবভিত্তিক ধর্মগুলোর যে কোনো একটি ধর্মে চলে যায়, তার ব্যাপারে তো وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ। আয়াতের সুযোগ গ্রহণ করে অন্যভাবে বলা যায়, সে মুসলমান পুরুষের বিবাহাধীনে থাকতে পারে। কিন্তু যে নারী হিন্দু অথবা মজূসী (অগ্নি উপাসক) হয়ে যায় অথবা অন্য কোনো আসমানী কিতাববিহীন ধর্মে চলে যায়, তাহলে তার মুসলমান পুরুষের বিবাহাধীন থাকাটা তো কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থী।

তৃতীয় ঃ যে নারী ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে তার ওপর ইসলামী আইন কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে ? আমরা একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে আছি।* আর এ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে মুসলমান, হিন্দু, শিখ—সবাই এক সমান। আমরা এ রাষ্ট্রের কাছে কি করে আশা করতে পারি যে, কোনো নারী মুসলমান থাকা অবস্থায় ইসলামী রীতি অনুযায়ী তার বিবাহ হয়েছিল, পরে সে, মনে করুন, শিখ অথবা আর্য সমাজের সাথে মিশে গেছে—এ রাষ্ট্রব্যবস্থা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করে তাকে এ বিবাহ বন্ধনে থাকতে বাধ্য করবে ?

এসব কারণে আমাদের মতে ধর্মত্যাগের ক্ষেত্রে সামারকান্দ ও বলখের আলেমগণের ফতোয়া থেকে ভারতীয় আলেমগণ মোটেই লাভবান হতে পারবেন না। মূলত দেখার বিষয় হচ্ছে, নারীরা কেন মুরতাদ হচ্ছে ? আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র দু চারজনই এ রকম হতে পারে যাদের আকীদা-বিশ্বাসের বাস্তবিকই কোনো পরিবর্তন এসেছে। বাস্তবিকপক্ষে যে জিনিস তাদেরকে ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা স্রেফ এই যে, যুলুম-নির্যাতনের অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান

* বইটি বিভাগ পূর্বকালে রচিত।—অনুবাদক

প্রচলিত আইনের অধীনে নারীদের ফরিয়াদ জানানোর কোনো সুযোগ নেই। স্বামী কঠোর থেকে কঠোরতর নির্যাতন করে। কিন্তু স্ত্রী তার থেকে খোলা করে নিতে পারে না। স্বামী অকর্মণ্য, পাগল অথবা ভয়ংকর হিংস্র প্রকৃতির অথবা ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত অথবা কঠিন বদ অভ্যাসে লিপ্ত, স্ত্রী তার নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না, পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে আছে—কিন্তু বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের কোনো পথ খোলা নেই। স্বামী নিখোঁজ রয়েছে, বছরের পর বছর ধরে তার কোনো খোঁজ-খবর নেই, স্ত্রীর জন্য জীবন ধারণ দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার এ বিপদ থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই।

এ ধরনের করুণ পরিস্থিতি মূলত নারীদের ইসলাম থেকে কুফরীর মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে। এখান সেখান থেকে ফিক্‌হের খুঁটিনাটি মাসয়ালা বের করে আনা এ প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার সঠিক পদ্ধতি নয়। এভাবে এ ভাগ্যাহত মহিলাদের কুফরীর আঁচলে আশ্রয় নেয়ার সুযোগটুকু বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে মুরতাদ হওয়ার পরিবর্তে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হবে। বরং এর সঠিক পথ এই যে, আমরা স্বয়ং আমাদের আইনগুলোকে একবার পর্যালোচনা করে দেখি এবং যেসব ইজতিহাদী আইনের কঠোরতার কারণে আমাদের বোন ও কন্যাদেরকে ইসলামের বন্ধন থেকে বের হয়ে কুফরীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হচ্ছে—সেগুলোকে পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংশোধন করে নিই। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বাধ্যতামূলক নির্দেশসমূহ (নুসূস) পর্যন্ত যতদূর বলা যায়, তার মধ্যে মুরতাদ হতে বাধ্য হবার মত কঠোরতা থাকা তো দূরের কথা, সামান্য কোনো ক্ষতি হওয়ার মত উপাদানও নেই। এ কঠোরতা কেবল কতিপয় ইজতিহাদী আইনের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এ ইজতিহাদী আইনকে অন্যান্য আইনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে মুসলিম মহিলাদের ধর্মত্যাগী হওয়ার পথকে চিরতরে বন্ধ করা যেতে পারে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষমতা প্রয়োগ

কুরআন মজীদে যদিও এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, "কোনো স্ত্রীলোকের বিবাহের ব্যাপারে তার অভিভাবকদের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে" কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এ নীতির যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, অভিভাবকদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এই নয় যে, নারীর জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ক্ষেত্রে তার নিজের মোটেই কোনো এখতিয়ার নেই। পক্ষান্তরে

রসূলুল্লাহ স. ইতিবাচকভাবে নারীদের এ অধিকার দিয়েছেন যে, বিবাহের ব্যাপারে তার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ একটি মেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলো, "আমার পিতা আমার মরযীর বিরুদ্ধে আমাকে বিবাহ দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "এ বিবাহ প্রত্যাখ্যান করার অথবা অনুমোদন করার এখতিয়ার তোমার রয়েছে।"

নাসাঈ গ্রন্থে খানসা' বিনতে খিযাম রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর মরযীর বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকেও একই অধিকার প্রদান করলেন।

দারু কুতনী গ্রন্থে হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, এ ধরনেরই একটি মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ স. স্বামী-স্ত্রীকে শুধু এ কারণে পৃথক করে দিলেন যে, স্ত্রীলোকটির অসম্মতিতে তাকে বিবাহ দেয়া হয়েছিল।

নাসাঈ গ্রন্থে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, একটি স্ত্রীলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলো যে, তার পিতা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে তার মরযীর বিরুদ্ধে তাকে বিবাহ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে বিবাহ ঠিক রাখার অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে বললো, "হে আল্লাহর রসূল! আমার বাপ-মা যা করেছেন তা আমি অনুমোদন করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের কেবল এটা জানিয়ে দেয়া যে, তাদের পিতারা এ ব্যাপারে কর্তৃত্বের অধিকারী নন।"

মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুওয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ

اَلاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَّلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا -

"বিধবা নারী তার পুনর্বিবাহের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং যুবতীর বিবাহের ক্ষেত্রে তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।"

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ

لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ -

"বিধবা নারীকে তার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত বিবাহ দেয়া যাবে না।"

৩. অভিভাবকের জোর-জবরদস্তি

উপরে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, শরীয়তের মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি মূলনীতি এই যে, বিবাহের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে তার পিতা অথবা কোনো অভিভাবক বিবাহ দেন, তাহলে এ অবস্থায় তার 'সম্মতি'র অধিকার বহাল থাকবে কি না? এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে আমাদের ফিক্‌হবিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে যদি তার পিতা বা দাদা ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ দিয়ে থাকে, তাহলে বয়োপ্রাপ্তির সাথে সাথে এই বিবাহকে বহাল রাখার অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার থাকবে। কিন্তু যদি তার পিতা অথবা দাদা তাকে বিবাহ দিয়ে থাকেন, তাহলে বিবাহ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার থাকবে না। কিন্তু যদি পিতা অথবা দাদার ক্ষমতার অপব্যবহার প্রমাণিত হয়, তাহলে তার এ অধিকার বহাল থাকবে। যেমন সে (স্বামী) ফাসেক অথবা নির্লজ্জ অথবা নিজের কাজকর্মে গর্হিত পন্থা অবলম্বনকারী এবং অপরিণামদর্শিতার জন্য কুখ্যাত।

"অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ওপর বাপ-দাদার জোর খাটানোর অধিকার আছে এবং তাদের দেয়া বিবাহকে সে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যাখ্যান করতে পারে না"—এ মতটি কুরআন মজীদের কোনো আয়াত অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।[৩৯]

---

৩৯. আল-মাবসূত গ্রন্থে ইমাম সারাখসী অনেক চেষ্টা করে একটি মাত্র প্রমাণ পেশ করতে পেরেছেন। তা হচ্ছে—হযরত আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নাবালেগ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি যখন বয়োপ্রাপ্তা হলেন, নবী স. তাঁকে একথা বলেননি: এ বিবাহ কবুল করার বা না করার তোমার অধিকার রয়েছে। অথচ নাবালেগ মেয়ের যদি এ ধরনের অধিকার থাকতো, তাহলে কুরআন মজীদের এখতিয়ারের আয়াত (সূরা আহযাবের ২৮ ও ২৯ আয়াত) নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ স. তাদের যেভাবে (তাঁর স্ত্রীত্বে থাকার বা না থাকার) এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন, এক্ষেত্রেও তিনি তাই করতেন।–৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৩।

এ থেকে জানা গেলো, অভিভাবকের জোর খাটানোর সমর্থনে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এ দুর্বল প্রমাণটি ছাড়া আর কোনো প্রমাণ পেশ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রমাণটি এতই দুর্বল যে, আমাকে অবাক হতে হয়, শামসুল আইম্মা সারাখসীর মত ব্যক্তিত্ব কিভাবে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের ভিত্তি এর ওপর স্থাপন করলেন। অথচ তিনি এতটুকু

(পরের পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বরং এটা ফিক্‌হবিদদের নিম্নোক্ত অনুমানের ওপর ভিত্তিশীল ঃ "বাপ-দাদা যেহেতু মেয়ের অকল্যাণকামী হতে পারেন না, তাই তাঁদের দেয়া বিবাহ মেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।" সুতরাং হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

চিন্তা করলেন না যে, যে মত তিনি গঠন করতে যাচ্ছেন তার পরিণতিতে অসংখ্য নারীর একটা অধিকার চিরকালের জন্য ব্যাহত হতে যাচ্ছে। একথা যদি সঠিক হতো যে, হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে বাপের দেয়া বিবাহে কন্যার বালেগ হওয়ার পর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নেই, তাহলে সেটা এ ক্ষেত্রেই সঠিক হতে পারতো 'যদি হযরত আয়েশা রা. বালেগ হয়ে নিজের পিতার দেয়া বিবাহ প্রত্যাখ্যান করতেন অথবা তিনি যদি এ বিবাহের বিরুদ্ধে 'প্রাপ্তবয়স্কার এখতিয়ার' প্রয়োগ করার অধিকার প্রার্থনা করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁকে এ জবাব দিতেন, "না, এখন তোমার এ অধিকার নেই। কেননা তোমার ছোট বেলায় তোমার পিতা তোমাকে বিবাহ দিয়েছেন।" কিন্তু এ ধরনের কোনো হাদীস বর্তমান নেই, বরং কোনো হাদীসেই এতটুকুও উল্লেখ নেই যে, হযরত আয়েশা রা. পরিষ্কার বাক্যে একথা বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আমাকে কোনো এখতিয়ার দেননি। তার সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তি কেবল এতটুকু কথার ওপর রাখা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আয়েশাকে 'এখতিয়ার' দেয়ার কথা যেহেতু কোনো হাদীসে উল্লেখ নেই——সুতরাং একথা মেনে নিতে হবে যে, তিনি তাঁকে (বিবাহ অনুমোদন করার অথবা প্রত্যাখ্যান করার) এখতিয়ার দেননি, আর যেহেতু তিনি তাঁকে এখতিয়ার দেননি, তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, এ ধরনের মেয়েদের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নেই।

এ ধরনের হালকা দলীল পেশ করার সময় শামসুল আইম্মার এটাও মনে ছিল না যে, হাদীসে কোনো ঘটনার উল্লেখ না হওয়াই সে ঘটনা সংঘটিত না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না ; আর না তাঁর এটা খেয়ালে এসেছিল যে, কোনো মেয়ে বালেগ হওয়ার পর নিজের পিতার কাজের ওপর সম্মত ছিল, সে এর বিরুদ্ধে কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি এবং সে পিতার বিরুদ্ধে 'প্রাপ্তবয়স্কার ক্ষমতা' প্রয়োগ করার মোটেই দাবি করেনি——এ অবস্থায় যদি তাকে এখতিয়ার না দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত একথার দলীল কি করে হতে পারে যে, বাপের বিরুদ্ধে কন্যার 'প্রাপ্তবয়স্কার ক্ষমতা প্রয়োগ' করার মত অধিকার মোটেই নেই ! এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে যদি মানুষের অধিকার খর্ব হতে থাকে, তাহলে কোনো ব্যক্তি এ দলীলও পেশ করতে পারে যে, অমুক জায়গায় অমুক ব্যক্তিকে (যে কখনো পানি চায়নি) যেহেতু পানি দেয়া হয়নি, তাই কাউকে পানি দেয়া উচিত নয়।

শামসুল আইম্মার এর চেয়েও অদ্ভুত একটি যুক্তি এই যে, যদি পিতার বিরুদ্ধে কন্যার 'প্রাপ্তবয়স্কার ক্ষমতা' প্রয়োগের অধিকার থাকে তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার দাবি উত্থাপন ব্যতিরেকেই তাঁকে এ এখতিয়ার অবশ্যই দিতেন। কেননা এখতিয়ারের আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাঁদেরকে (নিজ স্ত্রীদের) এ এখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। অন্য কথায় শামসুল আইম্মার যুক্তি এই যে, কোনো একটি ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ আসায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি করেছিলেন, ঠিক একই কাজ তিনি অপর একটি ব্যাপারেও করতেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোনো নির্দেশ দেননি।

উলামায়ে কিরাম চাচ্ছেন, এ ধরনের দুর্বল যুক্তিগুলো চোখ বুজে মেনে নেয়া হোক। কারণ যে ব্যক্তি তা মানতে রাজী হবে না, তার ওপর মুকাল্লিদ না হওয়ার সীলমোহর মেরে দেয়ার আশংকা রয়েছে।–গ্রন্থকার

فَلاَ خِيَارَلَهُمَا بَعْدَ بُلُوْغِهِمَا لاَنَّهُمَا كَامِلاَ الرَّئِ وَافِرَ الشَّفْقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا كَمَا اِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ ـ

"(ছেলে অথবা মেয়েকে যদি তাদের পিতা অথবা দাদা অল্প বয়সে বিবাহ দেন তাহলে) বালেগ হওয়ার পর এ বিবাহ অনুমোদন করা অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তাদের নেই। কেননা তাদের ব্যাপারে পিতা অথবা দাদার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত। (পিতা কখনো সন্তানের ক্ষতি করতে পারেন না)। তাছাড়া এদের প্রতি তাঁদের স্নেহ-মমতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং তাদের বালেগ হওয়ার পর তাদের সম্মতিতে বিবাহ হলে তা যেরূপ বাধ্যতামূলক, এটাও তদ্রূপ বাধ্যতামূলক।"

কিন্তু এটা কেবল কিয়াসভিত্তিক একটি রায়, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের মত অলংঘনীয় নয় এবং অলংঘনীয় হতেও পারে না। কুরআন-হাদীসের দলীল ও বুদ্ধিবৃত্তি—উভয় দিক থেকে এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। যেমন ঃ

এক ঃ সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অল্প বয়সী মেয়েকে উমার ইবনে আবু সালামার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ বালেগ হওয়ার পর এ বিবাহ প্রত্যাখ্যান করা অথবা অনুমোদন করার এখতিয়ার তার রয়েছে। এ হাদীস থেকে অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের জন্য 'প্রাপ্তবয়স্কার এখতিয়ার' সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। কেননা রসূলুল্লাহ্ স. এমন কোনো ব্যাখ্যা দেননি যে, তিনি যেহেতু মেয়ের বাপ নন, বরং চাচাত ভাই, এজন্য তাঁর দেয়া বিবাহ তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

দুই ঃ এটা একটা অদ্ভুত কথা যে, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের তার বাপ-দাদার বিরুদ্ধে নিজের রায় ব্যবহার করার অধিকার আছে, কিন্তু এ মেয়েই যদি নাবালেগ হয়, তাহলে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হবে। অথচ বিবাহের যাবতীয় ব্যাপারের সাথে নারীর সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি লক্ষ রেখে শরীয়তপ্রণেতা তাকে যে অধিকার দিয়েছেন তা উভয় অবস্থায়ই সমান। কোনো অভিভাবক 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী' এবং 'পরম স্নেহের আধার' হওয়ার ভিত্তিতে যদি জবরদস্তি করার অধিকারী হতে পারে, তাহলে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার উপরও তার সেই অধিকার থাকা উচিত, যেভাবে অপ্রাপ্তবয়স্কার ক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার ওপর যখন অভিভাবকের জোর-জবরদস্তি করার অধিকার নেই, তখন নাবালেগ কন্যার ওপর তার এ অধিকার থাকবে কেন ?

তিন ঃ বাপ-দাদার 'অপরিসীম স্নেহের আধার' এবং 'পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তের অধিকারী' হওয়াটা কোনো নিশ্চিত ও প্রমাণিত ব্যাপার নয়। শুধু প্রাবল্যের প্রতি লক্ষ করে একটি অনুমান (কিয়াস) দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু এ অনুমানের বিপরীতেও অনেক ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে এবং যাচ্ছে—যা থেকে অপরিসীম স্নেহের ও পরিপূর্ণ রায়ের প্রমাণ খুব কমই পাওয়া যায়।

চার ঃ যদি এ ধারণা সঠিকও হয়ে থাকে, তবুও এরূপ ঘটে যাওয়ার খুবই আশংকা রয়েছে যে, বাপ-দাদা সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরিসীম স্নেহের আধার ও পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তের অধিকারী হয়ে একটি নাবালেগ শিশুর সাথে তার নাবালেগ কন্যার বিবাহ দিলেন এবং ছেলেটি যৌবনে পদার্পণ করে তাঁদের আশার গুড়ে বালি দিয়ে অপদার্থ প্রমাণিত হলো, বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন ইসলামী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষার ত্রুটির ফলে অত্যন্ত পিশাচ চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে এবং মুসলমানদের চারপাশে এত কলুষ পরিবেশ বিরাজ করছে যার মারাত্মক প্রভাব যুবকদের চরিত্র ও অভ্যাসের ওপর পতিত হচ্ছে—এ অবস্থায় অল্প বয়সে বিবাহ দেয়ার প্রথাটি প্রতিরোধ করা খুবই প্রয়োজন এবং এসব বিবাহকে অন্তত বাধ্যতামূলক না করা উচিত। কেননা অনেক ছেলে—যাদের সম্পর্কে প্রথম দিকে একটা ভালো কিছু আশা করা যেত, পরবর্তী সময়ে হীনচরিত্র, কুঅভ্যাসে এবং আল্লাহ-বিরোধী আকীদা-বিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে বাপ-দাদার জবরদস্তিমূলক কর্তৃত্ব স্বয়ং তাদের জন্যই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ ঃ বাপ-দাদা তাঁদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করলে তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো মেয়ের 'প্রাপ্তবয়স্কার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার' ব্যবহার করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়বে। কেননা এরূপ অবস্থায় তাকে আদালতের সামনে নিজের বাপ-দাদার বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্য, অন্যায় আচরণ, নির্লজ্জতা, দুরভিসন্ধি, নির্বুদ্ধিতা, বোকামি ইত্যাদির প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর এটা তার জন্য শুধু কষ্টকরই নয়, বরং নিন্দনীয়ও বটে।

এসব কারণে ফিক্‌হের এ আনুষংগিক মাসয়ালাটি পুনর্বিবেচিত হওয়া দরকার। যুক্তি ও বিচক্ষণতার দাবি হচ্ছে, এ নিরেট ইজতিহাদী মাসয়ালার ক্ষেত্রে সংশোধন এনে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েকে তাদের বালেগ হওয়ার পর যে কোনো অবস্থায় 'প্রাপ্তবয়স্কার ক্ষমতা' প্রয়োগের অধিকার দেয়া উচিত।[৪০]

৪০. আমরা এখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের প্রসংগটি আলোচনা করিনি। কারণ বালেগ হওয়ার পরও তার তালাক দেয়ার পথ খোলা রয়েছে।–গ্রন্থকার

৪. প্রাপ্তবয়স্কার কর্তৃত্ব প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ

এ প্রসংগেও ফিক্‌হ্‌বিদদের আরো একটি ইজতিহাদী মাসয়ালা পর্যালোচনার যোগ্য। পিতা ও দাদা ছাড়া অপরাপর অভিভাবকের বেলায় তাঁদের ফতোয়া হচ্ছে, "তারা যদি তাদের অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, তাহলে সে প্রাপ্তবয়স্কার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। তবে শর্ত হচ্ছে, বালেগ হওয়ার প্রথম নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে অবিলম্বে সে তার অসম্মতি প্রকাশ করবে। সে যদি তার প্রথম মাসিক ঋতু প্রকাশ হতেই অনতিবিলম্বে এ অসম্মতির কথা জানিয়ে না দেয়, তাহলে তার এ এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।" মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা এ শর্ত কেবল অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কন্যার (বাকিরা) ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন। সায়্যিবা[৪১] ও নাবালেগ ছেলের ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, বালেগ হওয়ার পর যতক্ষণ সে নিজের সম্মতি প্রকাশ না করবে, তার জন্য বিবাহ বাতিলের অধিকার বহাল থাকবে।

অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার ক্ষেত্রে এই যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে এর সমর্থন আমরা কুরআন ও হাদীসে পেলাম না। এটাও একটা ইজতিহাদী মাসয়ালা এবং এর মধ্যেও সংশোধন আনা প্রয়োজন। বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার বালেগ হওয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ করার একমাত্র কারণ হচ্ছে—বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌছে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সে জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে নিজের যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বালেগ হওয়ার প্রথম নিদর্শন প্রকাশ পেতেই তার মধ্যে কোনো বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় এবং অবিলম্বেই তার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাও এসে যায়। তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হাঁ, এরূপ পরিবর্তন হয় তাহলে সাইয়্যেবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের অবস্থা কুমারী কন্যার অবস্থা থেকে ভিন্নতর হতে পারে না। সুতরাং এ দুজনের 'প্রাপ্তবয়স্কার এখতিয়ার'কে যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে নিজেদের সম্মতি প্রকাশ না করা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা হয়েছে, তখন কুমারী কন্যাকে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সময় না দেয়ার শেষ পর্যন্ত কি কারণ থাকতে পারে? একজন প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা (সায়্যিবা) ও একজন যুবকের তুলনায় একজন অনভিজ্ঞা কুমারী কন্যা এ অবকাশ পাওয়ার অধিক হকদার। কেননা এ অসহায় বালিকা তাদের উভয়ের তুলনায় খুবই অনভিজ্ঞা।

---

৪১. স্বামীহারা স্ত্রীলোক। যদি কোনো মেয়ে বালেগ হওয়ার পূর্বে পুরুষ সংসর্গ লাভ করে থাকে—চাই তা বিবাহের মাধ্যমে হোক অথবা যেনার মাধ্যমে—সেও সায়্যিবা গণ্য হবে।—গ্রন্থকার

৫. দেনমোহর

দেনমোহরের ক্ষেত্রে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আইনে এর জন্য কোনো সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে মোহরানার সর্বোচ্চ সীমা চল্লিশ উকিয়া[৪২] নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক মহিলা তাঁর একথায় আপত্তি তুলে বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا (তোমরা যদি স্ত্রীদের কাউকে অঢেল সম্পদও দিয়ে থাকো তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফেরত নিও না)-এর দৃষ্টিতে আপনার এটা করার কোনো অধিকার নেই। কুরআন থেকে তাঁর এ যুক্তি শুনে হযরত উমর রা. বললেন ঃ اِمْرَأَةٌ اَصَابَتْ وَرَجُلٌ اَخْطَاءَ (একজন মহিলা সঠিক কথা বলেছে, কিন্তু একজন পুরুষ ভুল করেছে)।

অতএব দেনমোহরের পরিমাণ সীমিতকরণের ব্যাপারে যতদূর বলা যায়, আইনে এর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অধিক পরিমাণ দেনমোহর নির্ধারণ করার জন্য বাড়াবাড়ি করা এবং পুরুষের সামর্থ্যের অধিক দেনমোহর ধার্য করা একটি অপসন্দনীয় কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْزِمُوا النِّسَاءَ الرِّجَالَ وَلاَ تَغَالُوْا فِى الْمُهُوْرِ -

"তোমরা নারীদেরকে পুরুষদের সাথে বাঁধতে চেষ্টা করো এবং দেনমোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করো না।"

আবু আমর আল-আসলামী রা. এক মহিলাকে দুই শত দিরহাম মোহরানা প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ করলেন। নবী স. বললেন ঃ

لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُوْنَ الدَّرَاهِمَ مِنْ اَوْدِيَتِكُمْ مَا زِدْتُمْ -

"তোমরা যদি নিজেদের নদী-নালায় দিরহাম প্রবাহিত পেতে, তাহলেও হয়ত অধিক মোহরানা দিতে না।"

হযরত আনাস রা. চার উকিয়ার (১৬০ দিরহাম) বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ

تَنْحِتُوْنَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرْضِ هٰذَا الْجَبَلِ -

"মনে হচ্ছে তোমরা এ পাহাড় খুঁড়ে রূপা বের করছো।"

৪২. চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া।–অনুবাদক

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নারীদের দেনমোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করো না। এটা যদি পার্থিব জীবনে সম্মানের বস্তু হতো এবং আখেরাতের জন্য তাকওয়ার ব্যাপার হতো, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তোমাদের চেয়ে অধিক বেশী পসন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের মধ্যে কারো মোহরানা বার উকিয়ার অধিক ছিল না।"

একথা তো হলো কেবল অধিক দেনমোহর ধার্য করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের দেশে যে প্রথা প্রচলিত হয়ে গেছে, তা এর চেয়েও ঘৃণ্য। এখানে হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকার বাকী মোহরানা বিবাহের দলীলে লিখে নেয়া হয়। কিন্তু এ বিরাট অংকের অর্থ তাদের পক্ষে আদায় করাও সম্ভব হয় না, আর তা ধার্য করার সময় এটা আদায় করার নিয়াতে লেখাও হয় না। এ প্রথা নিকৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে বিবাহের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصِدَاقٍ يَّنْوِىْ اَنْ لاَ يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَانَ دَيْنًا يَّنْوِىْ اَنْ لاَّ يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ -

"যে ব্যক্তি মোহরানার বিনিময়ে কোনো নারীকে বিবাহ করলো এবং তা পরিশোধ না করার নিয়াত রাখলো—সে যেনাকার, ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো, কিন্তু তা পরিশোধ না করার ইচ্ছা রাখলো—সে চোর।"[৪৩]–কানযুল উম্মাল

এটা হচ্ছে উল্লিখিত ধরনের মোহরানার অভ্যন্তরীণ দোষ বা অনিষ্ট। প্রকাশ্য ক্ষতিও এর চেয়ে কম মারাত্মক নয়। এ ধরনের মোহরানা নির্ধারণ

---

৪৩. এ হাদীস থেকে মোহরানা আদায় করার যে গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, তা সবার কাছে পরিষ্কার। যেসব লোক দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিজেদের আর্থিক সামর্থ্যের অধিক পরিমাণ মোহরানা নির্ধারণ করেছেন, আমি তাদেরকে উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে এ পরামর্শ দিব যে, তারা যেন নিজেদের স্ত্রীদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা গ্রহণ করার জন্য রাজী করান, যা তারা একবারে অথবা কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবেন। সৎকর্মশীল মহিলাদেরও আমি পরামর্শ দিতে চাই যে, তারা যেন এ হ্রাসকৃত পরিমাণ মোহরানা গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যান। অনন্তর প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে–যত শীঘ্র সম্ভব এ মোহরানার বোঝা থেকে মুক্ত হওয়া। মোহরানা হচ্ছে এক প্রকার ঋণ। বুঝেশুনে অথবা বেপরোয়াভাবে নিজের ওপর ঋণ রেখে মারা যাওয়া এতই ঘৃণ্য ব্যাপার যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএ ধরনের লোকদের জানাযা পড়তে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।–গ্রন্থকার

স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা স্বামীর জন্য এক প্রকার দেনা। তাই বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে এর বিকল্প পরিভাষা হচ্ছে দেনমোহর।–অনুবাদক

করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্বামী যেন স্ত্রীকে তালাক দিতে না পারে। কিন্তু এর পরিণতি হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বিভেদ দেখা দেয় এবং উভয়ের একত্রে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন মোহরানার এ বাড়াবাড়ি নারীদের জীবনের জন্য মুসীবত হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী শুধু মোহরানার মোকদ্দমার ভয়ে তালাক দেয় না এবং স্ত্রী বেচারী বছরের পর বছর বরং সারাটা জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে। আজকাল যেসব জিনিস নারীদের সচরাচর বিপদের মধ্যে ফেলে রেখেছে, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এ মোহরানার আধিক্য। যদি ন্যায়-ইনসাফের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ মোহরানা নির্ধারণ করা হয়, তাহলে প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সমস্যা জটিল আকার ধারণ করার আগেই সমাধান হয়ে যাবে।

আমাদের মতে এর সংশোধনের জন্য ইসলামী শরীয়তের বিরোধিতা না করে এ পন্থা অবলম্বন করা যায় যে, যদি মোহরে মু'আজ্জাল (مُعَجَّلٌ)[৪৪] হয়ে থাকে, তাহলে উভয় পক্ষ কোনো সীমা ছাড়াই যতদূর চায় নির্ধারণ করে নিতে পারে। কিন্তু যদি মোহরে মুআজ্জাল (مُؤَجَّلٌ)[৪৫] হয়ে থাকে, তাহলে তার চুক্তিপত্র যথারীতি স্ট্যাম্পের ওপর লেখা বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে এবং মোহরপত্রের ওপর শতকরা পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্প লাগাতে হবে। স্ট্যাম্পবিহীন অথবা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কম মূল্যের স্ট্যাম্পের লিখিত কোনো মোহরানার চুক্তিপত্র দাবি পেশের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। যদি এ রকম আইন তৈরি করে দেয়া যায়, তাহলে মোহরে মুআজ্জালেরও আপাদমস্তক ত্রুটিপূর্ণ এ পদ্ধতি সহজেই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন লোকেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করতে বাধ্য হবে এবং টাকা-পয়সার অপব্যয় করার পরিবর্তে নগদ অর্থে ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমির আকারে বিবাহের সময়ই মোহরানা আদায় করবে। অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেলে তো এ শর্ত পরিত্যাগও করা যেতে পারে।

৬. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ

এ অনুচ্ছেদে ঝগড়ার দুটি দিক রয়েছে। এক. স্বামী স্ত্রীর খোরপোশ ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য রাখে, কিন্তু তা করে না। দুই. ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য তার নেই।

প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে কাযী সকল সম্ভাব্য পন্থায় তাকে স্ত্রীর খোরপোশ দিতে বাধ্য করতে পারেন—এ ব্যাপারে সকল আইনবিদ একমত। কিন্তু

---

৪৪. যে মোহরানা তৎক্ষণাৎ নগদ আদায় করতে হয়।–গ্রন্থকার

৪৫. যে মোহরানা কিছুকাল পরেও আদায় করা যায়।–গ্রন্থকার

সে যদি কাযীর নির্দেশ পালন না করে, তাহলে এ অবস্থায় কি করা উচিত তা নিয়ে আইনজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবের আইনবিদদের মতে এ অবস্থায় কিছুই করার নেই। স্ত্রীলোকটি তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে—চাই তা স্বামীর নামে ঋণ নিয়ে হোক অথবা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে হোক অথবা নিজের কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্যে হোক।

পক্ষান্তরে মালিকী মাযহাবের আইনবিদদের মত হচ্ছে—এ অবস্থায় তালাক সংঘটিত করে দেয়ার অধিকার স্বয়ং কাযীর রয়েছে। একদল হানাফী আলেম মালিকী মাযহাবের এ ফতোয়া গ্রহণ করা পসন্দ করেছেন। তবে তাঁরা এর সাথে যে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে—স্ত্রীলোকটি যদি নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে থাকে অথবা সে নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে পৃথক থাকলে তার পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।

কিন্তু এ শর্ত মোটেই সঠিক মনে হয় না। কুরআন মজীদের দৃষ্টিকোণ থেকে খোরপোশ পাওয়াটা স্ত্রীর অধিকার। এর বিনিময়েই তার ওপর স্বামীর দাম্পত্য অধিকার অর্জিত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এ অধিকার পূরণ করতে অস্বীকার করে, তখন স্ত্রীলোকটিকে জোরপূর্বক তার বিবাহাধীনে বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। কোনো জিনিস নিয়ে তার বিনিময় দিতে এবং কোনো মাল নিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করতে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কেমন করে শেষ পর্যন্ত এ জিনিস এবং মালের অধিকারী হয়ে থাকতে পারে ? কোনো স্ত্রীলোক যতক্ষণ কোনো পুরুষের বিবাহাধীন থাকবে, তার ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব স্বামীর উপরই থাকবে। এ অবস্থায় স্ত্রী নিজে রুজি-রোজগার করার অথবা নিজের আত্মীয়-স্বজনের উপর বোঝা হওয়া অথবা এক যালেম স্বামীর নামে ঋণ পাওয়ার অযৌক্তিক চেষ্টা করার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কি ধরনের ইনসাফের ভিত্তিতে তার ওপর চাপানো হবে ?

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আবার হানাফী ফিকহ্‌বিদদের মত হচ্ছে—স্ত্রীলোকটিকে ধৈর্যধারণ ও সওয়াবের আশা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং তাকে বলা হবে ঃ ধারকর্জ করে অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য নিয়ে দিন কাটাও। ইমাম আযম রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে অবিবাহিত অবস্থায় এ ধরনের মেয়েদের ব্যয়ভার যারা বহন করতো, এ ক্ষেত্রেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ

ও আহমাদ ইবনে হাম্বল র.-এর মাযহাব এই যে, স্ত্রীলোকটি যদি এ ধরনের স্বামীর সাথে বসবাস করতে না পারে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করে তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেয়া হবে। ইমাম মালিক র.-এর মতে স্বামীকে এক, দুই অথবা তিন মাসের কিংবা একটা যুক্তিসংগত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হবে। ইমাম শাফিঈ র. মাত্র তিন দিনের অবকাশ অনুমোদন করেছেন। ইমাম আহমাদ র.-এর ফতোয়া এই যে, অবিলম্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দিতে হবে।

এক্ষেত্রে কুরআন মজীদের যে মূলনীতি وَبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তা-ই শুধু তিন ইমামের সমর্থনই করে না, বরং হাদীস ও সাহাবাদের কার্যাবলীও তাঁদের এ মতের সমর্থন করে। দারা কুতনী ও বায়হাকী গ্রন্থদ্বয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ফায়সালা উদ্ধৃত হয়েছে, "খোরপোশ না দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেয়া হবে।" হযরত আলী রা., হযরত উমর রা., হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকেও একথা বর্ণিত হয়েছে। তাবিঈদের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের ফতোয়াও তাই। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-ও বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার পর উপরোক্ত ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করেছেন। পক্ষান্তরে হানাফীদের দলীল হচ্ছে এ আয়াত ঃ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ط - الطلاق : ٧

"আর যাকে কম রিযিক দেয়া হয়েছে, সে তাকে আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অধিক ব্যয় করার দায়িত্ব তার ওপর চাপান না।"-সূরা আত তালাক ঃ ৭

কিন্তু এ আয়াতের দ্বারা কেবল এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, খোরপোশের জন্য শরীয়তে কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং খোরপোশ দানকারীদের সামর্থ্যের ওপর তার পরিমাণ নির্ভর করে। উল্লিখিত আয়াতের অর্থ এই নয় যে, যেখানে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার মত সামর্থ্যই বর্তমান নেই, সেখানে স্ত্রীলোকটিকে ভরণ-পোষণ ছাড়াই জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হবে। নিসন্দেহে এটা চরম সংকল্পের ব্যাপার। যে কোনো মহিলা বিপদাপদ ও উপোস সহ্য করেও স্বামীর সাথে বসবাস করতে সম্মত থাকে। ইসলাম এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করারই শিক্ষা দেয় এবং একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার এরূপ বৈশিষ্ট্যই হওয়া উচিত। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা এক

জিনিস, আর আইনগত অধিকার আরেক জিনিস। খোরপোশ পাওয়াটা স্ত্রীর আইনগত অধিকার। সে যদি স্বেচ্ছায় ও সন্তোষ সহকারে এ অধিকার ছেড়ে দেয় এবং খোরপোশ ছাড়াই স্বামীর সহযোগিতা করা পসন্দ করে, তাহলে এটা খুবই প্রশংসার ব্যাপার। কিন্তু সে যদি তার এ অধিকার পরিত্যাগ করতে না চায় অথবা পরিত্যাগ করতে না পারে, তবুও তাকে কষ্ট দিয়ে এবং জোরপূর্বক চরম সংকল্পের উচ্চতর স্থানে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে হবে—ইসলামী আইনের আদল ও ইনসাফের মধ্যে এরূপ করার কোনো অবকাশ নেই।

অতএব আমাদের মতে এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে সব মাযহাবের মধ্যে ইমাম মালিক র.-এর মাযহাবই সবচেয়ে উত্তম। এ মাযহাব স্বামীকে একটা যুক্তিসংগত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার পর বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেয়।

৭. অবৈধভাবে নির্যাতন করা

কুরআনের আয়াত ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا - النساء : ٣٤

"আর তোমরা যেসব নারীর অবাধ্যতার আশংকা করবে, তাদের বুঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাকো এবং প্রহার করো। অতপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের ওপর নির্যাতন করার অজুহাত তালাশ করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বৈধ কারণ ছাড়া নিজের স্ত্রীর ওপর কোনো প্রকার কঠোরতা বা নির্যাতন করার অধিকার স্বামীর নেই, চাই তা দৈহিক অথবা মৌখিক নির্যাতন হোক না কেন। যদি সে তা করে তবে স্ত্রীর আইনের আশ্রয় নেবার অধিকার আছে। এ ব্যাপারে আমরা কোনো বিস্তারিত নির্দেশ জানতে পারিনি। কিন্তু আমরা মনে করি ইসলামী আইনের মূলনীতির মধ্যে এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, এ ধরনের নির্যাতন থেকে নারীকে হেফাযত করার এবং অসহনীয় নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষমতা কাযীকে দেয়া যেতে পারে। আজকাল আমরা দেখছি, বিভিন্ন স্তরে নারীদের সাথে অন্যায় আচরণ করার একটা সাধারণ রীতি চালু হয়ে পড়েছে। 'স্বামীত্বে'র অর্থ মনে করা হচ্ছে যুলুম-নির্যাতন

ও জোর-জবরদস্তি করার সীমাহীন অবাধ লাইসেন্স। এ প্রবণতার প্রতিরোধের জন্য আইনের নতুন ধারা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরী। আর কিছু না হলেও অন্তত এতটুকু হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে, মারপিট ও গালি-গালাজের অভ্যাসকে খোলা দাবি করার বৈধ কারণসমূহের মধ্যে গণ্য করতে হবে। কোনো স্বামীর বিরুদ্ধে যদি এ ধরনের বদ অভ্যাস প্রমাণিত হয় তাহলে তার স্ত্রীকে কোনো বিনিময় ছাড়াই খোলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৮. সালিস নিয়োগ

এ ক্ষেত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখায়। কাশফুল গুম্মাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মোকদ্দমা তাঁর দরবারে পেশ করা হলে তিনি কুরআন শরীফের আয়াত فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا-এর নির্দেশ অনুযায়ী আদেশ দিলেন, "উভয়ে নিজ নিজ পক্ষ থেকে একজন করে সালিস মানবে।" অতপর তিনি সালিসদ্বয়কে সম্বোধন করে বলেন, "তোমাদের কাজ হলো—যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করে দেয়া উপযুক্ত মনে করো তবে তাই করবে।" অতপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এ সালিসদ্বয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী আছ ?" সে বললো, "হ্যাঁ, রাজী আছি।" অতপর তিনি পুরুষ লোকটিকে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, "তারা যদি আমাদের উভয়ের মাঝে আপোষ করে দেয় তাহলে আমি তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেব। আর যদি তারা পৃথক করে দেয় তবে আমি তা মানবো না।" একথার প্রেক্ষিতে তিনি বললেন ঃ

لَيْسَ ذٰلِكَ لَكَ لَسْتَ بِبَارِحٍ حَتّٰى تَرْضٰى بِمِثْلِ مَارَضِيَتْ بِهٖ ـ

"তোমার এ অধিকার নেই। তুমি ঐ মহিলার মত যতক্ষণ নিজের সম্মতি প্রকাশ না করবে, এ স্থান থেকে এক কদমও নড়তে পারবে না।"

স্বামী-স্ত্রীর এ ধরনের পারিবারিক ঝগড়ার ক্ষেত্রে যা বৃহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়—মীমাংসার এ পদ্ধতি গ্রহণ করা সবচেয়ে উত্তম। এ সম্পর্কে আইনের মধ্যে এমন কতকগুলো ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন, যার মধ্যে সালিসীর পন্থা, সালিসদের ক্ষমতা, তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পন্থা এবং মতভেদের ক্ষেত্রে বিচারালয়ের কর্মপন্থার বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকবে। ইসলামী আইনের মধ্যে এটা একটা খুবই মূল্যবান ব্যবস্থা যে, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদকে যতদূর সম্ভব

প্রকাশ্য আদালতে উত্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এ ধরনের বিবাদ যদি আদালতে এসেই যায়, তাহলে বিচারক এ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও ফায়সালা করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য গ্রহণ করবেন। এ প্রস্তাবকে সামাজিক জীবনের জন্য একটি রহমত মনে করা উচিত।

৯. দোষ প্রমাণে বিবাহ রদ (ফাস্খ) করার ক্ষমতা[৪৬]

স্বামী-স্ত্রীর দোষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। একদলের মত হচ্ছে—পুরুষ অথবা স্ত্রীর কারো দোষের ভিত্তিতে অপর পক্ষের বিবাহ বাতিল করার ক্ষমতা নেই। অতএব দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে ঃ

وَلاَ يَتَخَيَّرُ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِعَيْبِ الْاٰخَرِ وَلَوْ فَاحِشًا كَجُنُوْنٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَرَتَقٍ وَقَرْنٍ -

"স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একজন অপরজনের ত্রুটির কারণে বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার রাখে না, চাই তা যত মারাত্মক ত্রুটিই হোক না কেন। যেমন উন্মাদনা, ধবল, কুষ্ঠরোগ, পায়খানা-পেশাবের স্থান সংযোজিত ইত্যাদি।"

সাহাবাদের মধ্যে হযরত আলী রা. ও ইবনে মাসউদ রা. এবং মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে আতা, নাখঈ, উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইবনে আবী লাইলা, আওযায়ী, সাওরী, আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ র. প্রমুখের এই মত।

দ্বিতীয় দলের মত হচ্ছে, যেসব ত্রুটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ এর যে কোনো ত্রুটির কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে। যেমন উন্মাদনা, ধবল, কুষ্ঠরোগ, দুর্গন্ধযুক্ত মুখ, বিভিন্ন প্রকার ঘৃণিত রোগ এবং যৌনাঙ্গে এমন ধরনের ত্রুটি যা সহবাসে বিঘ্ন ঘটায়। এটা হচ্ছে ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব। অতএব মুহাম্মাদ ইবনুল জাযঈ (আল-কালবী আল-গারনাতী, ১১৯৩-১৩৪০ খৃ.) 'আল-কাওয়ানীনুল ফিক্‌হিয়্যা' গ্রন্থে উল্লিখিত দোষগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন ঃ

---

৪৬. 'খিয়ারে ফাস্খ' অর্থাৎ বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর একথা বলার ক্ষমতা, 'এ বিবাহ আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।'–গ্রন্থকার

اِذَا كَانَ فِىْ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ اَحَدُ الْعُيُوْبِ كَانَ لاٰخَرَ الْخِيَارُ فِى الْبَقَاءِ مَعَهُ وَالْفِرَاقِ-

"যদি এ ত্রুটিগুলোর মধ্যে কোনো একটি ত্রুটি পুরুষ বা স্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তার সাথে থাকা বা পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিকার অপরজনের রয়েছে।"

ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে উন্মাদনা, শ্বেত ও কুষ্ঠরোগের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু লজ্জাস্থানের ক্ষত, যা থেকে সবসময় ক্ষরণ হয়, মুখের দুর্গন্ধ, পাঁচড়া ইত্যাদি রোগে বিবাহ বাতিলের এখতিয়ার নেই। অবশ্য যদি স্ত্রীলোকদের দেহের অভ্যন্তরে এমন রোগ থেকে থাকে যা সহবাসে বিঘ্ন ঘটায় অথবা পুরুষ লোকটি যদি নপুংসক অথবা কর্তিত-লিঙ্গ হয়ে থাকে তবে এ অবস্থায় অপর পক্ষের বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ র.-এর মতে স্ত্রীর কোনো শারীরিক ত্রুটির ভিত্তিতে বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার স্বামীর নেই। কিন্তু স্বামীর উন্মাদনা, শ্বেত, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার রয়েছে।

উল্লিখিত মাযহাবগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় মাযহাবই কুরআন মজীদের শিক্ষার কাছাকাছি। কুরআনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে দুটি জিনিসই উদ্দেশ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এক. চরিত্র ও নৈতিকতার হেফাযত ; দুই. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি। উল্লিখিত দোষ-ত্রুটির বিদ্যমানতার এ দুটি উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী স্বভাবতই একে অপরকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয় অথবা একে অপরের প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। আমরা যেমন প্রথমে বর্ণনা করে এসেছি—এটা ইসলামের দাম্পত্য আইনের মূলনীতির অন্তরভুক্ত যে, দাম্পত্য সম্পর্ক যেন স্বামী-স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। উল্লিখিত দোষ-ত্রুটির কারণে বিবাহ বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা না রাখলে এ নীতিমালা ব্যাহত হয়ে যায়। ওপরে যেসব রোগের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবই ক্ষতিকারক এবং এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের ঘৃণার কারণে অথবা নিজের যৌন চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করার আশংকা রয়েছে। এজন্য উল্লিখিত ধরনের যাবতীয় রোগ ও দোষ-ত্রুটির কারণে স্বামী-স্ত্রীর জন্য বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার সংরক্ষিত থাকা উচিত।

এতো হলো স্বামী-স্ত্রীর বিবাহের পূর্বে পরস্পরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না থাকার এবং পরে তা জানার সাথে সাথে নিজের অসম্মতির কথা প্রকাশ করে দেয়ার ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগের প্রসংগ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিবাহের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অবস্থা অবহিত ছিল এবং তারা জেনেশুনেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে অথবা তাদের জানা ছিল না, কিন্তু পরে জানার পরও বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার প্রয়োগ করেনি অথবা বিবাহের পর এসব ত্রুটি দেখা দিয়েছে—এসব অবস্থায় পুরুষের কাছে তো এমন একটি উপায় বর্তমান রয়েছে যার মাধ্যমে সে যে কোনো সময়ে কাজ সমাধা করতে পারে অর্থাৎ তালাক। এছাড়া তার কাছে আরো একটি উপায় মওজুদ রয়েছে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ। কিন্তু নারীদের ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফিক্‌হবিদগণ কোনো উপায় বিবেচনা করেননি এবং কোনো ক্ষেত্রে কেউ তাদের মুক্তি পাওয়ার পন্থা বের করেছেন, আবার কেউ বের করেননি। এ প্রসংগে যেসব ফতোয়া রয়েছে তা আমরা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করে তার পর্যালোচনা করবো।

১০. নপুংসক, লিঙ্গ কর্তিত ইত্যাদি

স্বামী যদি কর্তিত লিঙ্গ হয় তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি তোলার অধিকার রয়েছে এবং ব্যাপারটি তদন্ত করার পর অনতিবিলম্বে বিচ্ছেদ করিয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে প্রায় সব ফিক্‌হবিদই ঐকমত্য পোষণ করেন।

স্বামী যদি নপুংসক হয় এবং স্ত্রী যদি বিচ্ছেদ দাবি করে তাহলে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালার ভিত্তিতে তাকে চিকিৎসার জন্য এক বছরের সময় দিতে হবে। এরপরও যদি সে সংগমে সক্ষম না হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ফিক্‌হবিদগণ এর সাথে নিম্নলিখিত শর্তগুলো জুড়ে দিয়েছেন ঃ

১. স্ত্রী যদি বিবাহের পূর্বেই তার পুরুষত্বহীনতার কথা না জেনে থাকে কেবল তখনই এ হুকুম কার্যকর হবে। কিন্তু সে যদি পূর্ব থেকে তার এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে এবং স্বেচ্ছায় তার সাথে বিবাহ বসে তাহলে বিচ্ছেদের দাবি তোলার অধিকার তার নেই।

২. স্ত্রীর যদি বিবাহের পূর্বে এটা জানা না থাকে, কিন্তু পরে জানার পরও সে তার বিবাহাধীনে থাকার জন্য প্রকাশ্যভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে —তাহলে তার বিবাহ বাতিলের দাবি তোলার অধিকার অবশিষ্ট থাকবে না।

৩. স্বামী যদি একবারও সংগম করতে সক্ষম না হয়ে থাকে এবং কেবল তখনই বিচ্ছেদ করিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় সে যদি একবারও সংগম করতে সক্ষম হয়, চাই তা কোনো রকমেই হোক না কেন, তাহলেও স্ত্রী বিচ্ছেদের দাবি তোলার অধিকার রাখে না।

উল্লিখিত শর্তগুলোর কোনো একটির পক্ষেও কুরআন ও হাদীসের কোনো প্রমাণ বর্তমান নেই এবং আমরা এ শর্ত তিনটিকে সঠিক মনে করি না। যদি কোনো নারী ইচ্ছাকৃতভাবে আহাম্মকী করে কোনো ব্যক্তিকে নপুংসক জানা সত্ত্বেও তার কাছে বিবাহ বসে, তাহলে তার জন্য এ শাস্তি যুক্তিসংগত ও উপযোগী হতে পারে না যে, তাকে সমস্ত জীবন পুরুষত্বহীন এক স্বামীর সাথে কাটাতে বাধ্য করা হবে। এতে যে কি ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে তা এতটা সুস্পষ্ট যে, এটা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের বেকুফ নারীর জন্য এতটুকু শাস্তিই যথেষ্ট যে, তাকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দিতে হবে।

বিবাহের পর যদি স্ত্রী জানতে পারে যে, তার স্বামী নপুংসক এবং প্রথম দিকে সে তার সাথে বসবাস করতে রাজী হয়ে থাকে—তাহলে এটা এমন কোনো মারাত্মক অপরাধ নয় যে, সারা জীবন তাকে এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হবে। একটি অনভিজ্ঞা মেয়ে প্রথমে এ প্রকৃতিগত দুরবস্থার কথা অনুমান করতে পারে না, এক নপুংসকের স্ত্রী যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। হতে পারে সে তার সৎ স্বভাবের কারণে এ ধারণা করেছে যে, স্বামী যদি নপুংসক হয় তাতে কি আছে ? আমি এভাবেই তার সাথে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু পরে সে এমন এক অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হলো, যে সম্পর্কে প্রথমে তার কোনো ধারণাই ছিল না। সে তার স্বাস্থ্যের অবনতি অথবা পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে অস্থির হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা করলো। এ অবস্থায় এটা কি জায়েয হবে যে, তার প্রথম দিককার সম্মতিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, তুমি প্রথমেই যে ভুল করেছ তার শাস্তি এই যে, এখন তুমি মাথা ঠুকে মরো অথবা নিজের মান-ইজ্জতকে জলাঞ্জলি দিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করো। আমরা যতদূর চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি, এটা কুরআন মজীদের শিক্ষার পরিপন্থী। এর পরিণতিতে এমনসব অনিষ্ট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে যা এ নারীর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমাজেও ছড়িয়ে পড়বে এবং ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও স্থানান্তরিত হবে। এতবড় ক্ষতি স্বীকার করার পরিবর্তে একজন পুরুষ লোকের ক্ষতি স্বীকার করাই ভালো। মূলত বিবাহ বিচ্ছেদেও তার কোনো

ক্ষতি হবে না। স্ত্রীলোকটির ভুলের জন্য যদি তাকে শাস্তি দিতে হয় তবে সর্বাধিক এতটুকু দেয়া যেতে পারে যে, তাকে পুরো মোহরানা অথবা এর অংশবিশেষ থেকে বঞ্চিত করা যায়। আমার মতে এটাও বাড়াবাড়ির মধ্যে শামিল। কেননা যে ব্যক্তি নপুংসক হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করেছে—শাস্তি তো তারই হওয়া উচিত।

তৃতীয় শর্তটিও আমার ধারণায় অত্যন্ত কঠোর। বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে শরীয়তের যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা এ ধরনের দাম্পত্য সম্পর্কের মাধ্যমে কখনো পূর্ণ হতে পারে না। ইসলামের আইন কোনো আসমানী জীবের জন্য নয়, বরং সর্বসাধারণের জন্যই। সর্বসাধারণের মধ্যে যেসব মহিলাকে দেখতে পাওয়া যায় তাদের জন্য যদি এটা অসম্ভব নাও হয়, তবে চরম কঠিন তো বটেই যে, একবার অথবা দু-চারবার স্বামীর সাথে যৌনতৃপ্তি লাভ করাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এরপর সারাটা জীবন সে এ সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে হাসি-খুশিতে কাটিয়ে দিবে এবং ইজ্জত-আব্রুকে যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, শতকরা পঞ্চাশজন নারী এরূপ ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম, কিন্তু তবুও অবশিষ্ট পঞ্চাশ ভাগ নারীর কি করুণ অবস্থা হবে—যাদের ধৈর্য, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মান এতটা উন্নত নয়? তাদের পাপ কাজে জড়িয়ে পড়া এবং সমাজে তাদের কারণে নানা রকম দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়ার দায়দায়িত্ব কি এ আইনের ওপর বর্তাবে না, যা তাদের জন্য হালালের পথ বন্ধ করে তাদেরকে হারামের পথে চলতে বাধ্য করেছে?

অতএব আমাদের মতে সংগমে অক্ষমতাজনিত যে কোনো ত্রুটির বিরুদ্ধে, চাই তা বিবাহের পূর্ব থেকেই বর্তমান থাকুক অথবা বিবাহের পরেই হোক, স্ত্রীর জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার থাকা উচিত। এক বছরের সময়সীমার মধ্যে যথার্থ পরিমাণ চিকিৎসা করানোর পরও যদি এ ত্রুটি দূর না হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেয়া উচিত।

ফিক্‌হবিদগণ বলেছেন, 'এক বছর চিকিৎসা গ্রহণ করার পরও স্বামী যদি একবারও সংগম করতে সক্ষম হয়, চাই তা কোনো রকমেই হোক না কেন, স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি তোলার অধিকার চিরদিনের জন্য বাতিল হয়ে যাবে।' এর মধ্যেও অনর্থক কঠোরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের মতামতের ওপর নির্ভর করাই সবচেয়ে উত্তম। চিকিৎসার পরও যদি বিশেষজ্ঞের মত এই হয় যে, সে স্ত্রী সহবাস করতে পূর্ণরূপে সক্ষম হয়নি, তাহলে বিবাহ ভেঙে দেয়া উচিত।

ফিক্‌হবিদগণ নপুংসকের জন্য যে বিধান রেখেছেন, অণ্ডকোষ-কর্তিত ব্যক্তির জন্যও একই আইন রেখেছেন। অর্থাৎ তাকেও চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এক বছরের সময় দিতে হবে। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তার সহবাসে সক্ষম হওয়ার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষেত্রে অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তি ও লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, পুরুষ চাই লিঙ্গ কর্তিত হোক অথবা অণ্ডকোষ কর্তিত, উভয় অবস্থায়ই সে সংগম করতে সমানভাবেই অক্ষম। কোনো চিকিৎসাই তার এ হারানো ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারে না। অতএব অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তি এবং লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির জন্য একই আইন হওয়া উচিত।

১১. উন্মাদ বা পাগল

উন্মাদ ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত এই যে, তার চিকিৎসার জন্য এক বছর সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। এ সময়-সীমার মধ্যে সে যদি সুস্থ না হয় তাহলে তার স্ত্রীকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়ে দিতে হবে। ফিক্‌হবিদগণও এ মত প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন পন্থায় প্রাসংগিক ক্ষেত্রে এ নির্দেশই বলবৎ রেখেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে যে ব্যক্তি বিবাহের পূর্ব থেকেই পাগল ছিল এবং সে বিবাহের পর সহবাস করতে সক্ষম হয়নি, কেবল তার বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ দিক থেকে চিন্তা করলে মনে হয় সেও যেন নপুংসক এবং এজন্য তাকে এক বছরের অবকাশ দেয়া হচ্ছে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে যদি মাঝে মাঝে পাগলামি দেখা দেয় তাহলে তাকে চিকিৎসার জন্য এক বছরের সময় দেয়া হবে। আর তা যদি স্থায়ী হয় তাহলে সে লিঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির হুকুমের আওতায় পড়বে এবং কোনো সময়-সুযোগ না দিয়েই বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দিতে হবে।

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে স্থায়ী পাগল ও অস্থায়ী পাগল—উভয়ের ক্ষেত্রেই চিকিৎসার জন্য এক বছরের সময় দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে সে যদি সুস্থ না হয় তাহলে বিবাহ ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু এর সাথে মালিকী মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণ নিম্নলিখিত শর্তগুলো জুড়ে দিয়েছেন ঃ

৮—

১. যদি বিবাহের পূর্ব থেকেই উন্মাদ হয়ে থাকে এবং স্ত্রীলোকটি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তার কাছে বিবাহ্ বসেছে—এ ক্ষেত্রে সে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করতে পারে না।

২. বিবাহের পর যদি সে জানতে পারে যে, তার স্বামী পাগল এবং তার সাথে বসবাস করার সম্মতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে থাকে তাহলে বিচ্ছেদের অধিকার তার থাকবে না।

৩. বিবাহের পর যদি উন্মাদনা দেখা দেয়, তাহলে স্ত্রী কেবল তখনই বিচ্ছেদের দাবি তুলতে পারে যদি সে তার স্বামীর পাগলামি দেখা দেয়ার পর তার সাথে বসবাস করার সম্মতি প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে না থাকে এবং নিজের ইচ্ছা ও সম্মতিতে তাকে সহবাসের সুযোগ না দিয়ে থাকে।

এসব শর্তের ধরন ঠিক নপুংসকের অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তের অনুরূপ। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এর কোনো উৎস নেই এবং এসব শর্তের বিরুদ্ধে আমাদের ঠিক একই অভিযোগ রয়েছে। কোনো স্ত্রীলোককে জোরপূর্বক একটি পাগলের বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা অবস্থায় শরীয়ত, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার উদ্দেশ্য কখনো পূর্ণ হতে পারে না। সে যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তার কাছে বিবাহ বসেও থাকে তাহলে তার জন্য এতটুকু শাস্তিই যথেষ্ট যে, তাকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করা হবে। আর বিবাহের পর যদি সে তার পাগলামি সম্পর্কে জানতে পারে এবং প্রথম দিকে তার সাথে বসবাস করার প্রকাশ্য সম্মতি জ্ঞাপন করে থাকে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এটা আত্মিক ও দৈহিক দিক থেকে তার জন্য অসহনীয় হয়ে দেখা দেয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে এমন কোনো অপরাধ করেনি যে, এর শাস্তিস্বরূপ তাকে সারাটা জীবন পাগলের সাথে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও আশংকায় পরিপূর্ণ অবস্থায় কাটাতে বাধ্য করতে হবে।

বিবাহের পর যদি উন্মাদনা সৃষ্টি হয় এবং এর প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রী যদি স্বামীভক্তি, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সরলতা ও ভদ্রতাসুলভ আবেগ নিয়ে তাকে ছেড়ে চলে যেতে রাজী না হয়ে থাকে, যথাসাধ্য তার দেখাশোনা করে থাকে এবং আগের মতো দাম্পত্যসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখা ভালো মনে করে থাকে, তাহলে এটা কি করে বাধ্যতামূলক হতে পারে যে, স্বামীর উন্মাদনা যখন এ বেচারীর জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়ালো তখনো তাকে এ বিবাহের বন্ধন থেকে রেহাই দিতে অস্বীকার করা হবে? তাহলে এ শর্ত আরোপ করার পিছনে আইনের উদ্দেশ্য কি এই যে, কোনো স্ত্রীলোকের স্বামীর মধ্যে যখনই পাগলামির উপসর্গ দেখা দিবে সে

তৎক্ষণাৎ তার পিছনের সমস্ত ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে ভুলে গিয়ে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাকে ছেড়ে চলে যাবে ? কেননা তার মনে তো এ আশংকা দানা বাঁধা থাকবে যে, পাগলামির মাত্রা যদি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন স্বামীর প্রতি তার এ সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠা তার নিজের জীবনের জন্যই বিপদ হয়ে দেখা দিবে এবং এর একটা বিরাট মাশুল তাকে দিতে হবে।

এ ধরনের শর্তগুলো আরোপ করে পুরুষদের অধিকারসমূহকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে পেশ করা হয়েছে, অপরদিকে নারীদের সাথে বড়ই কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়েছে। নারী যদি অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা পাগল হয়ে যায় অথবা ঘৃণিত বা ক্ষতিকর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে পুরুষ তাকে তালাক দিতে পারে অথবা দ্বিতীয় বিবাহ করে আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু পুরুষ যদি এসব ক্রটির কোনো একটিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে স্ত্রী তাকে না তালাক দিতে পারে, আর না তার বর্তমান থাকা অবস্থায় পুনর্বিবাহ করতে পারে। তার জন্য বিচ্ছেদের পথ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এখন যদি একটি মাত্র পথেও এমন সব বিধিনিষেধ আরোপ করে রাখা হয় যার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার রেহাই পাওয়ার আর কোনো উপায়ই অবশিষ্ট থাকে না—তাহলে এটা ইসলামী আইনের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ ও ভারসাম্যের যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে তার পরিপন্থী হবে।

এ ধরনের যাবতীয় ব্যাপারে কুরআন মজীদের সেই আয়াতই আমাদের পথনির্দেশ হওয়া উচিত যাতে বলা হয়েছে, বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ন্যায়নীতি ও সৌজন্যবোধ থাকা দরকার। নারীদের যদি পুরুষের বিবাহাধীনে রাখতে হয় তাহলে এভাবে রাখতে হবে যে, তাতে নির্যাতন, মানবিক যাতনা ও বাড়াবাড়ি থাকবে না এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘিত হওয়ার আশংকা থাকবে না। কিন্তু যদি কোথাও দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এ অত্যাবশ্যকীয় শর্তগুলো পূর্ণ না হয় তাহলে সসম্মানে বিদায় দেয়ার কুরআনী নীতির ওপর আমল করতে হবে। এখন কে বলতে পারে, এক পাগল অথবা প্রমেহ, শ্বেত অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত স্বামীর সাথে জোরপূর্বক বেঁধে রাখার চেয়ে কোনো নারীর ওপর নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করার মারাত্মক আর কোনো পথ আছে কি ? আর একথা কে না বুঝে, যে নারীকে জোরপূর্বক এ অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশিত সীমারেখা লংঘন করার ব্যাপারে তার জীবনে যে কি পরিমাণ সুযোগ সৃষ্টি হতে

পারে ? এসব সুযোগ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একজন সাধারণ মহিলার জন্য কতটা কষ্টকর ?

১২. নিখোঁজ স্বামীর প্রসংগ

নিখোঁজ স্বামীর ব্যাপারে কুরআন মজীদে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান নেই। হাদীসসমূহ থেকেও কোনো নির্ভরযোগ্য বিধান জানা যায় না। ইমাম দারা কুতনী র. তাঁর সুনান গ্রন্থে একটি হাদীস সন্নিবেশ করেছেন। এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَأَتُهُ حَتّٰى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ -

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিখোঁজ ব্যক্তির অবস্থা সঠিকভাবে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত তার স্ত্রী তারই থাকবে।"

কিন্তু এ হাদীসটি সাওয়ার ইবনে মুসআব ও মুহাম্মাদ ইবনে শারজীল আল-হামদানীর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁরা উভয়ই হাদীসবিশারদদের মতো বিতর্কিত ব্যক্তি (مجروح)। ইবনে শারজীল সম্পর্কে ইবনে আবু হাতেম লিখেছেন, انه يروى عن المغيرة مناكير اباطيل (সে মুগীরার কাছ থেকে এমন সব কথা বর্ণনা করে যা অসমর্থিত, প্রত্যাখ্যাত ও মিথ্যা)। সাওয়ার (سـوار) ইবনে মুসআব সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান লিখেছেন, "সে প্রত্যাখ্যাত ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে শারজীলের চেয়েও অধিক খ্যাত।" সুতরাং এ হাদীসটি দুর্বল এবং প্রমাণ হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য। উপরন্তু নিখোঁজ ব্যক্তির প্রসংগে হযরত উমর রা., হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের রায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের মধ্যে কারোরই হাদীসটি জানা ছিল না এবং তাঁদের সমসাময়িক কোনো সাহাবী এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কেননা হাদীসটি যদি কোনো সাহাবীর জানা থাকতো তাহলে তিনি এটা উল্লিখিত সাহাবীদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান ঘটাতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে শারজীল এ হাদীস মুগীরা ইবনে শো'বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুগীরা) হযরত উমর রা. ও হযরত উসমান রা.-এর সময়কার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তরভুক্ত ছিলেন এবং গভর্নরের উচ্চ পদে সমাসীন ছিলেন। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে

যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস তাঁর জানা ছিল এবং তিনি এরপরও হযরত উমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে এর পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাঁধা দেননি ? এসব কারণে এটা বুঝা উচিত যে, নিখোঁজ স্বামীর প্রসংগে কুরআন-হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, বরং বিশেষজ্ঞ আলেমদের ইজতিহাদ এ বিধানের উৎস।

সাহাবা, তাবিঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ সম্পর্কে রায় কায়েম করতে গিয়ে মতভেদ করেছেন। হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মত হচ্ছে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হবে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, যুহরী, নাখঈ, আতা, মাকহূল ও শা'বীরও এ মত। ইমাম মালিক র.-ও এ মত গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র.-এর ঝোঁকও রয়েছে এ দিকেই।

অপরদিকে রয়েছেন হযরত আলী রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। তাঁদের রায় হচ্ছে—নিখোঁজ ব্যক্তি যতদিন ফিরে না আসে অথবা তার মৃত্যুর খবর জানা না যায় ততদিন তার স্ত্রীকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈ রাহেমাহুমুল্লাহ এ মত গ্রহণ করেছেন। স্ত্রীর অপেক্ষা করার জন্য ইমাম আবু হানীফা র. এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, নিখোঁজ ব্যক্তির সমবয়সী লোক যতদিন তার বসতিতে অথবা তার দেশে জীবিত থাকবে, স্ত্রী ততদিন তার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকবে। অতপর প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ আলেম স্ব স্ব অনুমানের ভিত্তিতে মানুষের সর্বাধিক বয়সের সীমা নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন, এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ যত বয়স পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, স্ত্রী ততদিন তার নিখোঁজ স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তিরিশ বছর বয়সে নিখোঁজ হয় তাহলে তার স্ত্রীকে কারো মতে নব্বই বছর, কারো মতে ষাট বছর এবং কারো মতে পঞ্চাশ বছর অথবা কমপক্ষে চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। কেননা কতকের মতে মানুষের স্বাভাবিক বয়স ১২০ বছর, আবার কেউ ১০০ বছর অথবা ৯০ বছর অথবা ৭০ বছর নির্ধারণ করেছেন। অতএব এখন যে নারীর বয়স বিশ বছর, তাকে যে বিশেষজ্ঞ সবচেয়ে বেশী রেয়াত দিয়েছেন তাঁর ফতোয়া অনুযায়ী ষাট বছর বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত নিখোঁজ স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে। অতপর সে পুনর্বিবাহের অনুমতি পাবে।

এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে আমরা যখন কুরআন মজীদের মৌলিক নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তখন হযরত উমর রা. এবং তাঁর অনুসারীদের মতই সহীহ মনে হয়। ইসলামী আইনের প্রাণসত্তা, এর আদল-ইনসাফ, এর ভারসাম্য ও এর স্বভাবের সাথে এটাই অধিক সামঞ্জস্যশীল। কুরআন মজীদে আমরা দেখতে পাই, চারজন স্ত্রী পর্যন্ত রাখার অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে এ হুকুম দেয়া হয়েছে ঃ

فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

"তোমরা এক স্ত্রীর দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, অপর স্ত্রীরা ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

এ আয়াত থেকে জানা যায়, কুরআন মজীদ স্ত্রীলোককে ঝুলন্ত বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রেখে দেয়া পসন্দ করে না। কুরআন যখন স্বামীর বর্তমানে এটা পসন্দ করে না, তাহলে তার নিখোঁজ অবস্থায় কি করে তা পসন্দ করতে পারে ? অন্যত্র স্বামীদের হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা করো তাহলে সর্বাধিক চার মাস এরূপ করতে পারো। এরপর তোমাদের তাদের তালাক দিতে হবে। এখানে আবার ইসলামী আইনের ভাবধারা এই মনে হচ্ছে যে, কোনো স্ত্রীলোককে তার স্বামীর সঙ্গ থেকে এত দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে না যা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে অথবা আল্লাহর নির্দেশিত সীমারেখা লংঘনের কারণ হবে। পুনরায় বলা হয়েছে ঃ وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا এর পরিষ্কার উদ্দেশ্য এই যে, দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ক্ষতি ও নির্যাতনের উপসর্গ থাকা উচিত নয়। আর একথা পরিষ্কার যে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যে সীমাহীন দুর্ভোগ রয়েছে। এর সাথে যে আয়াতে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে খোলা করতে কোনো দোষ নেই—তাও প্রণিধানযোগ্য।

এখানে আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখার সংরক্ষণকে দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এটা কে অস্বীকার করতে পারে যে, যেই নারীর স্বামী বছরের পর বছর ধরে নিখোঁজ রয়েছে তার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্থির থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। এ সমস্ত আইনের মূলনীতি, এর পরিণামদর্শিতা ও যৌক্তিকতা, রহস্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে একথা উত্তমরূপেই বুঝা যায় যে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে এক অজানা ও অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়া এবং তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেয়া জায়েয নয়।

১৩. নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে মালিকী মাযহাবের আইন

এসব কারণে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ নিখোঁজ ব্যক্তির বেলায় মালিকী মাযহাবের নির্দেশ অনুসারে ফতোয়া দেয়া পসন্দ করেছেন। অতএব এখন আমাদের দেখা দরকার, এ সম্পর্কে মালিকী মাযহাবের বিস্তারিত নির্দেশ কি ? মালিকী মাযহাব অনুযায়ী নিখোঁজ স্বামীর তিনটি অবস্থা রয়েছে এবং এর প্রতিটির নির্দেশ ভিন্নতর। যেমন ঃ

১. নিখোঁজ ব্যক্তি এতটুকু পরিমাণ সম্পদ রেখে যায়নি যাতে তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ সংকুলান হতে পারে। এ অবস্থায় বিচারক তাকে স্বামীর জন্য অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ দিবেন না, বরং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর বিনা প্রতীক্ষায় নিজ কর্তৃত্ববলে তাকে তালাক দিবেন অথবা তাকে নিজের ওপর তালাক আরোপ করার অধিকার দিবেন।[৪৭] শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবও এক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবের সমর্থন করে। কেননা তাঁদের মতে ভরণ-পোষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকাটাই বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট।

২. নিখোঁজ ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে গেছে, কিন্তু তার স্ত্রী যুবতী এবং তাকে যদি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমাণ অবস্থায় রাখা হয় তাহলে তার পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এ অবস্থায় হাকিম (বিচারক) তাকে এক বছর অথবা ছয় মাস অথবা যতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসংগত মনে করেন ততদিন স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ দিবেন। এক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবও মালিকী মাযহাবের অনুরূপ, বরং কঠিন অবস্থায় উভয় মাযহাবে অপেক্ষা করা ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেয়া জায়েয রয়েছে। অনন্তর পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকার ক্ষেত্রে এটা জরুরী নয় যে, স্ত্রী স্বয়ং মুখ খুলে বলবে, 'আমাকে এ স্বামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও অন্যথায় আমি যেনায় লিপ্ত হবো।' বরং এটা কাযীর বিবেচ্য বিষয় যে, যে নারী স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ নিয়ে এসেছে, তার বয়স কত, সে কি ধরনের পরিবেশে বসবাস করে এবং অভিযোগ নিয়ে আসার পূর্বে কতকাল স্বামীর অপেক্ষায় কাটিয়েছে। এসব বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ

---

৪৭. বিচ্ছেদের উদ্দেশ্য স্বয়ং হাকিমের তালাক দেয়ার পরিবর্তে বরং স্ত্রীলোকটিকে নিজের ওপর তালাক আরোপ করার অনুমতি দেয়াই অধিক উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা রা.-কে বলেছিলেন ঃ

اَنْتِ اَمْلَكُ بِنَفْسِكِ اِنْ شِئْتِ اَقَمْتِ مَعَ زَوْجِكِ وَاِنْ شِئْتِ فَارَقْتِيْهِ ـ

"তুমিই তোমার মালিক। তোমার স্বামীর সাথে বসবাস করার অথবা তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার এখতিয়ার তোমার রয়েছে।"–গ্রন্থকার

করে বিচারক নিজেই রায় কায়েম করতে পারবেন যে, তার আখলাক-চরিত্রের হেফাযতের জন্য তার অপেক্ষার সময়-সীমা কি পরিমাণ কমিয়ে দেয়া উচিত।

৩. নিখোঁজ ব্যক্তি ধন-সম্পদও রেখে গেছে এবং স্ত্রীর পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশংকাও নেই ; এক্ষেত্রেও আবার মাসয়ালার চারটি দিক রয়েছে।

এক ঃ নিখোঁজ ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিম দেশে অথবা এমন কোনো দেশে হারিয়ে গিয়ে থাকে যার সাথে সভ্য দুনিয়ার যোগাযোগ রয়েছে এবং যেখানে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব, তাহলে তার স্ত্রীকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকার নির্দেশ দেয়া হবে।

দুই ঃ সে যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিখোঁজ হয়ে থাকে তাহলে তার অনুসন্ধানের জন্য সম্ভাব্য চেষ্টা চালানোর পর স্ত্রীকে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

তিন ঃ সে যদি নিজ এলাকার কোনো দাঙ্গা বা সংঘর্ষের সময় নিখোঁজ হয়ে থাকে তাহলে দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার পর তাকে খোঁজ করার জন্য সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অতপর অপেক্ষা করা ছাড়াই তাকে মৃত্যুর ইদ্দাত অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করার অনুমতি দিতে হবে।

চার ঃ সে যদি এমন কোনো অসভ্য জনপদে নিখোঁজ হয়ে থাকে যার সাথে সভ্য দুনিয়ার কোনো যোগাযোগ নেই এবং সেখানে তার খোঁজ নেয়ারও কোনো সম্ভাব্য সুযোগ নেই, তাহলে তার স্ত্রীকে একজন মধ্যম শ্রেণীর লোকের যে পরিমাণ হায়াত পাওয়ার আশা করা যায়—সে পরিমাণ সময় অপেক্ষা করতে হবে। এ ধরনের লোকের সম্ভাব্য বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। কেউ আশি বছর, কেউ পঁচাত্তর বছর বলেছেন। কিন্তু আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট সম্পদ রেখে যায় এবং স্ত্রীরও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কোনো আশংকা না থাকে—কেবল তখনই এটা প্রযোজ্য হবে। হানাফী আলেমগণ নিজেদের ফতোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত মালিকী মাযহাবের অনুসরণ করেন। কিন্তু এর সাথে সম্পৃক্ত শর্তগুলো উপেক্ষা করে থাকেন। তাঁরা নিখোঁজ স্বামীর ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় চার বছর অপেক্ষায় থাকার ফতোয়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, বিশেষ করে বর্তমান যুগে যেখানে নৈতিক চরিত্রের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য অসংখ্য কারণ-উপকরণ সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেখানে যে কোনো স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করানোর জন্য জেদ ধরা শরীয়তের পরিণামদর্শিতার পরিপন্থী। আজ ইসলামী সমাজে সেই

শক্তিশালী শৃংখলা ব্যবস্থা বর্তমান নেই যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইসলাম যেসব বিধিনিষেধ কায়েম করেছিল, ইসলাম বিরোধী রীতিনীতির প্রচলন মানুষকে তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। উলঙ্গ ছবি, যৌন অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দেয়া উপন্যাস ও গল্পের বই, রেডিও-টেলিভিশনের যৌন উত্তেজনামূলক গান ইত্যাদি থেকে শহর ও জনপদের লোকদের বেঁচে থাকার কোনো পথ নেই। উপরন্তু দেশের প্রচলিত আইন যেনা-ব্যভিচারকে বৈধ করে রেখেছে। তাছাড়া পর্দার শরয়ী বিধান কার্যত চালু না থাকার কারণে গায়রে মুহরিম (যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যৌন অনুভূতিকে নাড়া দেয়ার এত বড় উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরহেযগারী ও দীনদারীর সাথে জীবন যাপন করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

এ অবস্থায় কোনো যুবতী নারী নিজের নিখোঁজ স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় দুই-তিন বছর কাটিয়ে দেয়ার পর অপারগ হয়ে যখন আদালতের শরণাপন্ন হয় তখন আদালত যদি তাকে আরো চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয় তাহলে এটা কতটুকু যুক্তিসংগত হতে পারে ? এটা এতই কঠোর নির্দেশ যে, তা কেবল নারীর জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। সুতরাং আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, নিখোঁজ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মালিকী মাযহাবের সব শর্তগুলো আইনের অন্তরভুক্ত করে নেয়া উচিত। নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রীর বয়স, তার পরিবেশ এবং স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার পর যতদিন অপেক্ষা করে সে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে এ সময়টাও বিবেচনা করার জন্য আইনের উপধারায় শামিল করে নেয়া উচিত।

১৪. নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ফিরে এলে তার বিধান

স্ত্রীকে অপেক্ষায় থাকার জন্য আদালতের দেয়া সময়-সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসে তাহলে এর হুকুম কি ? এ প্রসংগে উল্লিখিত প্রশ্নটিও আলোচনার দাবি রাখে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বেই যদি তার স্বামী ফিরে আসে তাহলে এ স্ত্রী তারই থাকবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় বিবাহের পর যদি সে ফিরে আসে এবং দ্বিতীয় স্বামী তখনো তার সাথে নির্জনবাস করে থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থায় তার ওপর প্রথম স্বামীর কোনো অধিকার থাকবে না। ইমাম মালেক র. তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে হযরত উমর

রা.-এর এ মতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ মত অনুযায়ী মালিকী মাযহাবের ফতোয়া দেয়া হয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালা অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় প্রথম স্বামী স্ত্রীকে ফেরত পাবে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার নির্জনবাস, এমন কি সন্তানই ভূমিষ্ঠ হোক না কেন ? উপরন্তু নির্জনবাস হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে এ নারীর মোহরানাও আদায় করে দিতে হবে। হানাফী আলেমগণ এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেন, হযরত উমর রা. এবং শেষ দিকে হযরত আলী রা. এ ফায়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু ইমাম মালিক র.-এর মতে হযরত উমর রা.-এর নিজ মত প্রত্যাহার করা প্রমাণিত নয়।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালা হচ্ছে—স্ত্রীলোকটি যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে থাকে, অতপর প্রথম স্বামী ফিরে আসে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি স্ত্রী ফেরত চাও না মোহরানা ফেরত চাও ? সে যদি মোহরানা ফেরত নেয়া অথবা মাফ চাইয়ে নেয়া পসন্দ করে তাহলে স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় স্বামীর কাছেই থাকবে। কিন্তু সে যদি স্ত্রীকে ফেরত পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে তাহলে স্ত্রীলোকটিকে দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তালাকের ইদ্দাত পালন করতে হবে। অতপর তাকে প্রথম স্বামীর কাছে সোপর্দ করা হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে তার মোহরানা আদায় করে নিতে হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত উমর রা.-এরও এরূপ একটি মত উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ইমাম মালেক র.-এর মতে একথা প্রমাণিত নয়।

আমাদের মতে এ তিনটি ফায়সালার মধ্যে হযরত উমর রা.-এর ফায়সালাই সবচেয়ে উত্তম যা ইমাম মালেক র. দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এটা পরিষ্কার যে, স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরও যদি তার প্রথম স্বামীর অধিকার বলবৎ থাকে, তাহলে এ ধরনের মহিলাকে বিবাহ করতে কোন্ পুরুষ পসন্দ করবে ? কেননা তাকে বিবাহ করে দ্বিতীয় স্বামী সবসময়ই এটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হবে—এই না জানি কখন তার প্রথম স্বামী ফিরে আসে এবং তার কাছ থেকে একে ছিনিয়ে নিয়ে যায়! তাকে স্ত্রীও হারাতে হবে, আবার মোহরানাও পরিশোধ করতে হবে এবং সন্তান হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবস্থা আরো করুণ হয়ে দাঁড়াবে। মায়ের চলে যাওয়ার পর সন্তান অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ ধরনের শর্ত আরোপ করার মধ্যে মহিলাদের জন্য সীমাহীন ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এর অর্থ এই যে, একটি দীর্ঘ অসহনীয় সময় পর্যন্ত

অপেক্ষায় কাটানোর পরও তার বিপদ শেষ হয়নি। বিচারালয় থেকে মুক্তির সনদ অর্জন করার পরও তার পায়ে একটি জিঞ্জির লটকেই রয়েছে এবং তাকে সারাটা জীবন ঝুলন্ত বা অপেক্ষমাণ অবস্থায় কাটাতে হবে।

১৫. লি'আন

স্বামী চাই পরিষ্কার ভাষায় তার স্ত্রীর ওপর যেনার অপবাদ দিক অথবা সন্তান সম্পর্কে বলুক যে, 'সে তার সন্তান নয়'—উভয় অবস্থায় লি'আন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ ধরনের একটি মোকদ্দমা উত্থাপিত হলে তিনি বাদী-বিবাদী উভয়কে সম্বোধন করে তিনবার বললেন ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ؟

"আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোনো একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের কোনো একজন কি তাওবা করবে ?"

উভয়ে যখন তাওবা করতে অস্বীকার করলো, তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে স্বামীকে চারবার এই বলে শপথ করালেন, স্ত্রীর বিরুদ্ধে সে যে অভিযোগ এনেছে এ ব্যাপারে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবার তাকে এভাবে শপথ করানো হলো, যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। অতপর স্ত্রীলোকটিকেও এভাবে চারবার শপথ করানো হলো যে, তার ওপর যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা। পঞ্চমবার তাকে বলানো হলো, যদি এ অপবাদ সত্য হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এরপর নবী স. বললেন ঃ

ذَاكُمُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا۔

"কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি লি'আনকারী দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদের এটাই হলো পথ। এ বিচ্ছেদের পর তারা আর কখনো পুনরায় একত্র হতে পারবে না।"

স্বামী আরজ করলো, যে মাল আমি তাকে মোহরানা বাবদ দিয়েছিলাম তা ফেরত দেয়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। এর উত্তরে নবী স. বললেন ঃ

لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَبِمَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذٰلِكَ اَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا ـ

"তুমি তোমার মাল ফেরত পাবে না। তুমি যদি তার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তুমি এ মালের বিনিময়েই তার লজ্জাস্থানকে বৈধ করে নিয়েছিলে। আর তুমি যদি এর ওপর মিথ্যা অভিযোগ এনে থাকো তাহলে মাল ফেরত পাবার অধিকার তোমার থেকে আরো দূরে চলে গেছে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ফায়সালা থেকে নিম্নলিখিত আইনগুলো পাওয়া যায় ঃ

১. লি'আন কাযীর সামনে হতে হবে। পুরুষ ও নারী পরস্পরের সামনে অথবা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সামনে লি'আন করতে পারে না, আর এরূপ করলেও তাতে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না।

২. লি'আন করানোর পূর্বে বিচারক পুরুষ ও নারী উভয়কে সুযোগ দিবেন যাতে তাদের কোনো একজন দোষ স্বীকার করতে পারে। উভয়ে যখন নিজ নিজ কথায় অবিচল থাকবে কেবল তখনই লি'আন করানো হবে।

৩. উভয়ের পক্ষ থেকে লি'আনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিচারক ঘোষণা করবেন যে, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়ে দেয়া হয়েছে। জমহূর আলেমদের মতে লি'আন দ্বারা স্বয়ং বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার রায় হচ্ছে—বিচ্ছেদের জন্য হাকিমের হুকুম অত্যাবশ্যকীয়। এ মাসয়ালা সম্পর্কে যেসব নির্ভরযোগ্য হাদীস আমাদের কাছে পৌছেছে তা সবই ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতের পোষকতা করে। কেননা এ ধরনের প্রতিটি মোকদ্দমায় লি'আনের কাজ শেষ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, নবী স. বিচ্ছেদের জন্য কেবল লি'আনকেই যথেষ্ট মনে করেননি।

৪. লি'আনের মাধ্যমে যে বিচ্ছেদ ঘটে তা চিরকালের জন্য। এরপর উভয়ে যদি পুনর্বিবাহে সম্মত হয় তাহলে এটা কোনো রকমেই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তাহ্লীল সংক্রান্ত আইন কার্যকর হবে না যা حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. লি'আনের দ্বারা মোহরানা বাতিল হয় না। স্বামীর অভিযোগ বাস্তবিক পক্ষে সত্য হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় তাকে মোহরানা অবশ্য

দিতে হবে অথবা আগে দিয়ে থাকলে তা ফেরত চাওয়ার অধিকারও তার থাকবে না।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করার পর স্বামী যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে, তাহলে জমহূর আলেমদের মতে তার ওপর যেনার অপবাদ দেয়ার ফৌজদারী দণ্ড (৮০ বেত্রাঘাত) কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে সে ফৌজদারী দণ্ডের উপযুক্ত নয়, বরং তাকে কয়েদ করা হবে। অনুরূপভাবে স্বামীর লি'আন করার পর স্ত্রী যদি তা করতে অস্বীকার করে, তাহলে ইমাম শাফিঈ, মালেক ও আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহুর মতে তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হবে এবং ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে তাকে বন্দী করা হবে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা র.-এর মাযহাব সর্বাধিক সহীহ ও পরিণামদর্শিতার ওপর ভিত্তিশীল। কিন্তু এ উপমহাদেশে (বিভাগ-পূর্ব ভারতের প্রেক্ষাপটে) লি'আন করতে অস্বীকার করার অপরাধে শাস্তি দেয়ার সুযোগ নেই। এজন্য আপাতত শরীয়তের বিধানের উপযুক্ত কাঠামো এই হবে যে, স্বামী যদি লি'আন করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীকে মানহানির দাবি তোলার অধিকার দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করা হবে। আমাদের ওপর যতক্ষণ অমুসলিম সরকার চেপে থাকবে এবং আমরা যতদিন ইসলামী দণ্ডবিধি অনুসরণ করতে অক্ষম থাকবো— উল্লিখিত ব্যবস্থা কেবল ততদিনই বলবৎ থাকবে।

১৬. একই সময়ে তিন তালাক প্রদান

একই সময়ে তিন তালাক দিয়ে স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়া কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী চরম অপরাধ। উম্মতের আলেমগণের মধ্যে এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে যা কিছু মতবিরোধ রয়েছে তা শুধু এ নিয়ে যে, এ ধরনের তিন তালাক কি এক তালাক রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) গণ্য হবে, না তিন তালাক মুগাল্লাযা (চূড়ান্ত) গণ্য হবে ? কিন্তু এটা যে বিদআত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ—এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তালাকের যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন— একই সময়ে তিন তালাক দেয়া এ নিয়মের পরিপন্থী। শরীয়তের বিধানে যে সতর্ক দৃষ্টিভংগী নিহিত রয়েছে এতে তাও ব্যাহত হয়। হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সময় তিন তালাক দিয়ে বসলো। রসূলুল্লাহ স. অসন্তুষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ ؟

"আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায়ই সে কি মহামহিম আল্লাহর কিতাব নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ?"

অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ স. এটাকে চরম গুনাহের কাজ গণ্য করেছেন। হযরত উমর রা. সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনায় এ পর্যন্ত এসেছে যে, যে ব্যক্তিই একই সাথে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে তাঁর কাছে আসতো, তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এরূপ কাজের জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমাদের যুগে এটা একটা সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, লোকেরা কোনো সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে ঝটপট তিন তালাক দিয়ে বসে। অতপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে শরীয়তের মধ্যে ছল-চাতুরী খুঁজে বেড়ায়। কেউ মিথ্যা শপথ করে তালাকই অস্বীকার করে বসে। কেউ বা হিলা করানোর উপায় খুঁজে বেড়ায়। আবার কেউ তালাকের ব্যাপারটি গোপন রেখে স্ত্রীর সাথে পূর্বের সম্পর্ক বজায় রাখে। এভাবে একটি গুনাহের পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য আরো অসংখ্য গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়। এ অনাচারের প্রতিরোধ করার জন্য একই সময়ে তিন তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় করে দেয়ার ওপর এমন কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন, যাতে লোকেরা এ ধরনের কাজ করতে সাহস না পায়। উদাহরণস্বরূপ এর একটি উপায় এই যে, যে মহিলাকে একই সাথে তিন তালাক দেয়া হয়েছে তাকে আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করার অধিকার দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অন্ততপক্ষে মোহরানার অর্ধেক হতে হবে।

এছাড়াও এ অনাচারের প্রতিরোধের জন্য আরো অনেক পন্থা বের করা যেতে পারে। আমাদের আলেম সমাজ ও আইন বিশেষজ্ঞগণ চিন্তা-ভাবনা করে তা বের করতে পারেন। উপরন্তু লোকদের মধ্যে এ মাসয়ালাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার যে, এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তাহলে লোকেরা যে অজ্ঞতার কারণে এতে জড়িয়ে পড়ছে, সঠিক পন্থার ব্যাপক প্রচারের ফলে তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে।

❒

শেষ কথা

এ পুস্তকে ইসলামের দাম্পত্য আইনের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে এবং যেসব মাসয়ালার কারণে বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে তার সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এ দাবি করছি না যে, ইসলামী আইনকে আমি যতটুকু বুঝতে সক্ষম হয়েছি তাই সঠিক। আর এ ব্যাপারেও আমার কোনো জেদ নেই যে, সমস্যার সমাধানের জন্য আমি যেসব পরামর্শ রেখেছি তা হুবহু গ্রহণ করতে হবে। যাই হোক, মানুষের সিদ্ধান্তের মধ্যে ভুল হওয়া এবং সঠিক হওয়া উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। কোনো ব্যক্তিই নিজের রায় সম্পর্কে দাবি করতে পারে না যে, সে ভুলের উর্ধে এবং আল্লাহর ওহীর মত এর অনুসরণ করাও অপরিহার্য।

এ দীর্ঘ আলোচনা, অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় আমার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, কুরআন মজীদ ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত থেকে আমি ইসলামের দাম্পত্য আইনের যে মূলনীতি হৃদয়ংগম করতে পেরেছি তা বর্ণনা করা এবং মহান সাহাবাগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ মূলনীতি থেকে যেসব প্রাসংগিক মাসায়ালা বের করেছেন তার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এমন সব আনুষংগিক মাসয়ালা বের করা, যা আমাদের মতে বর্তমান যুগের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে উপকারী ও উপযুক্ত হতে পারে। এখন আলেম সমাজ, চিন্তাশীল ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে, প্রশস্ত দৃষ্টিভংগী এবং কিতাব-সুন্নাতের ক্ষেত্রে চিন্তা ও দূরদর্শিতাকে কাজে লাগিয়ে আমার এ প্রস্তাব ও পরামর্শ সম্পর্কে চিন্তা করা। যদি এর মধ্যে কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে এটা যেন তাঁরা সংশোধন করে দেন এবং যদি কোনো জিনিস সঠিক মনে করেন তাহলে শুধু এ কারণেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে এর লেখক চতুর্থ হিজরী শতকের পরিবর্তে চতুর্দশ হিজরী শতকে জন্মগ্রহণ করেছেন।

পরিশেষে হায়দরবাদ ও বৃটিশ ভারতের কোনো কোনো ব্যক্তি আইনের যে খসড়া প্রণয়ন করেছেন, আমি সংক্ষেপে এ সম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করতে চাই।[৪৮] আমার মতে এসব খসড়া অপূর্ণাংগ এবং যুগের প্রয়োজন

৪৮. এখানে এসব খসড়ার কেবল বিষয়বস্তু নিয়েই আলোচনা, আইন পরিষদ স্বয়ং কোনো ইসলামী আইন পাশ করার অধিকার রাখে কিনা——এ নিয়ে আমার আলোচনা নয়। এ পরিষদ ইসলামী দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে যে আইন পাশ করবে, তা অক্ষরে অক্ষরে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেকই হোক না কেন, আর যাই হোক তা শরঈ আইন হতে পারে না।

অনুযায়ী তা যথেষ্ট নয়। 'এ্যাংলো-মোহামেডান ল'-এর ত্রুটি, অমুসলিম আদালতের শত বছরের দৃষ্টিভংগী এবং বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় অনুসৃত কর্মপন্থার মাধ্যমে যে ক্ষতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে—তা এ ধরনের সংক্ষিপ্ত খসড়ার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়। যদি বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এসব ক্ষেত্রে হানাফী ফিক্‌হের পরিবর্তে মালিকী ফিকহের আইন অনুযায়ী মীমাংসা করা হবে অথবা যদি কোনো কোনো প্রাসংগিক মাসয়ালার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়—তাহলে যেসব বিচারকের ইসলামী আইন এবং বিভিন্ন মাযহাবের আনুষংগিক বিধান সম্পর্কে কোনো ব্যাপক জ্ঞান নেই এবং যাদের মন-মগজে 'এ্যাংলো-মোহামেডান ল'-এর ভূত চেপে আছে, তারা এর সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবে না।

এ বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সংশোধনের জন্য, বিশেষ করে দাম্পত্য ব্যাপারসমূহের জন্যই আইনের একটি ব্যাপক সংকলন তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এ পর্যন্ত এ বইয়ের পাতাগুলোতে একথাই আমি বলে এসেছি। এটা এত সহজ কাজ নয়, বরং এটা সময় ও শ্রমের দাবি রাখে। এটা এক ব্যক্তির পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। এ উদ্দেশ্যে সুযোগ্য আলেমদের একটি নির্বাচিত জামাআতকে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে একাগ্র মনে বসতে হবে। তাঁদেরকে এই মনে করে কাজ করতে হবে, তাঁরা কেবল পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের কিতাবসমূহ থেকে খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে হুবহু নকল করে নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন না, বরং উম্মতের সমস্যাসমূহের সঠিক সমাধান বের করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার কারণে তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে—ইসলামী আইনের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা যাতে শরীআতের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে এবং জাতির দীন-ঈমান, আখলাক-চরিত্র ও যাবতীয় বিষয়ের হেফাযত করার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় হতে পারে।

□

পরিশিষ্ট-১

অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফতোয়া

দিল্লী থেকে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে একটি ছাপানো ফতোয়া পাঠিয়েছেন। এর বিষয়বস্তু আপনা থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশিষ্ট আলেমগণ অনৈসলামী পন্থায় এ বিষয়টির সমাধান করার দিকে আসক্ত বলে মনে হয়। এজন্য এ বিষয়টির গুরুত্ব আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ফতোয়া ও তার জবাব নীচে দেয়া হলো।

ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ও শরীয়তের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মুফতীদের কাছ থেকে অনতিবিলম্বে কিতাব, সুন্নাত ও ফিকহের আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর প্রামাণিক ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর হচ্ছে ঃ

প্রশ্ন ঃ ১. যদি কোনো অমুসলিম বিচারক অথবা অমুসলিম সালিস বা পঞ্চায়েত মুসলমান পুরুষ ও নারীর বিবাহ ইসলামী আইন অনুযায়ী বাতিল করে দেয় অথবা অমুসলিম বিচারক, সালিস বা পঞ্চায়েত স্ত্রীর ওপর স্বামীর অত্যাচার প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাক দেয়, যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিম বিচারকের এ অধিকার আছে, তাহলে কি বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হবে ? শরীয়ত অনুযায়ী স্ত্রীর কি এ অধিকার অর্জিত হবে যে, অমুসলিম ব্যক্তির দেয়া তালাক এবং বাতিলকৃত বিবাহকে শরীয়তসম্মত মনে করে ইদ্দাত অতিবাহিত করার পর অথবা অন্য যে কোনো অবস্থায় হোক—অন্য মুসলমানের কাছে বিবাহ বসতে পারে ?

২. উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয় অর্থাৎ অমুসলিম ব্যক্তির দেয়া তালাক ও বিবাহ-বাতিলকরণ শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয় এবং অমুসলিম ব্যক্তির দেয়া তালাক ও বিবাহ বাতিলকরণের পরও এ নারী তার স্বামীর বিবাহাধীনেই থেকে যায়—এ অবস্থায় যে নারী অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বসবে এবং এ দ্বিতীয় ব্যক্তির এটাও জানা আছে যে, এ নারী অমুসলিম বিচারক অথবা সালিস বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তালাক অর্জন করেছে, তাহলে এ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে কি না ? দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা হারাম হবে কি না এবং উভয়কে শরীয়তের দৃষ্টিতে যেনাকার মনে করা যাবে কি না ?

৩. দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তাঁর এ বিবাহ বাতিল গণ্য হওয়া অবস্থায় যদি এ দ্বিতীয় ঔরসে তার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে ব্যভিচারজাত সন্তান গণ্য হবে কি না ? এ সন্তান এ দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে কি না ?

অনুগ্রহপূর্বক এ প্রশ্নগুলোর প্রামাণিক জবাব ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী দিয়ে বাধিত করবেন ইত্যাদি।

জবাব ঃ এ প্রশ্নমালার মধ্যে মৌলিক গলদ এই যে, এর মধ্যে কেবল অমুসলিম বিচারক, সালিস ও পঞ্চায়েত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। অথচ প্রশ্নটা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, মানুষ আল্লাহবিমুখ হয়ে স্বয়ং যে বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে নিয়েছে এবং যার মীমাংসা মানুষের মনগড়া আইনের ওপর ভিত্তিশীল, আল্লাহর আইন তা জায়েয বলে স্বীকার করে কি না ? এর সাথে আরো আনুষংগিক গলদ এই যে, এখানে কেবল বিবাহ বাতিল ও বিচ্ছেদ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছে। অথচ মৌলিক দিক থেকে এ বিষয়গুলোর ধরন অন্যান্য বিষয়ের ধরন থেকে ভিন্নতর নয়।

কেবল বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারেই নয়, বরং যাবতীয় ব্যাপারে অমুসলিম আদালতের ফায়সালা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতি ও সমর্থনযোগ্য নয়। মহান রাজাধিরাজ আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে স্বাধীনভাবে খেয়াল-খুশিমত যে রাষ্ট্র কায়েম হয়, ইসলাম তার স্বীকৃতি দেয় না। যে আইন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ইচ্ছামত তৈরি করে নিয়েছে—ইসলাম তারও স্বীকৃতি দেয় না। যে আদালত তার আসল মালিক ও আইনদাতার রাষ্ট্রে তাঁর অনুমোদন ছাড়া আল্লাহদ্রোহীদের দ্বারা কায়েম হয়েছে—ইসলাম এসব আদালতের বিবাদ শ্রবণ করা ও রায় দেবার অধিকারই স্বীকার করে না। বৃটিশ রাজত্বের আওতায় ক্রাউনের (রাজা বা রাণী) অনুমতি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত আদালতের বৃটিশ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে যে মর্যাদা হতে পারে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐসব আদালতের মর্যাদাও তাই। এসব বিচারালয়ের বিচারক, কর্মচারী, উকীল এবং তাদের মাধ্যমে বিচার মীমাংসাকারীগণ যেভাবে ইংরেজ আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী, অপরাধী এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে, অনুরূপভাবে আসমান-যমীনের মালিকের রাজত্বের মধ্যে তাঁর 'সুলতান' (সনদপত্র) ছাড়া যে বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে এবং যেখানে তাঁর অনুমোদিত আইন বাদ দিয়ে অন্য কারো অনুমোদিত আইনের ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালা করা হয়, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের বিচার

ব্যবস্থা বিদ্রোহী, অপরাধী ও চরম শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। এর বিচারক অপরাধী, কর্মচারীবৃন্দ অপরাধী, এর উকীলগণ অপরাধী, এর সামনে বিচার প্রার্থনাকারী অপরাধী এবং এর সমস্ত আইন-কানুন চূড়ান্ত-ভাবেই প্রত্যাখ্যাত। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের ফায়সালা যদি ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হয়েও থাকে তবুও তা মূলতই ভ্রান্ত। কেননা এর মূলে বিদ্রোহ বর্তমান রয়েছে। মনে করুন, যদি তারা চোরের হাত কাটে, যেনাকারীর ওপর বেত্রাঘাত বা রজম (পাথর মেরে হত্যা) কার্যকর করে, মদ্যপের ওপর ফৌজদারী দণ্ড কার্যকর করে, তবুও চোর, যেনাকারী ও শরাবখোর শাস্তি ভোগের দরুন নিজ নিজ অপরাধ থেকে পবিত্র হবে না এবং এমনকি স্বয়ং এ আদালত কোনো অধিকার ছাড়া কোনো ব্যক্তির হাত কাটা, তার ওপর বেত্রাঘাত বা রজম করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কেননা সে আল্লাহর প্রজাদের ওপর যে ক্ষমতার চর্চা করেছে, তাঁর দেয়া আইনের দৃষ্টিতে এ অধিকার তার ছিলো না।[৪৯]

যদি কোনো অমুসলিম বিচারকের পরিবর্তে তার চেয়ারে কোনো নামমাত্র মুসলমান বিচারক সমাসীন হয় তখনো এ আদালতের শরঈ মর্যাদা পূর্ববৎ থাকবে। আল্লাহদ্রোহী সরকারের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর করার এখতিয়ার অর্জন করে যে ব্যক্তি মামলা-মোকদ্দমার শুনানী গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে নির্দেশ জারী করে, সে অন্ততপক্ষে বিচারক হিসাবে তো মুসলমান নয়, বরং নিজেই বিদ্রোহী হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং তার নির্দেশ বাতিল গণ্য হওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে পারে ?

যখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার বিদ্যমান থাকে এবং তাতে মুসলমানরাও শরীক থাকে, এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হোক অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সব বাসিন্দা মুসলমান হোক, তারা আল্লাহহীন গণতান্ত্রিক মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছে—এ

---

৪৯. এ প্রসংগে বার্মা ও মালয়ের ওপর জাপানের অধিকার বহাল থাকাকালে যেসব সামরিক অফিসার 'স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র' ও 'আযাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সরকার ১৯৪৫ সালের শেষদিকে এবং ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে যেসব মামলা দায়ের করে, তার কার্যবিবরণী অধিক ধারণা লাভের জন্য সহায়ক হবে, বিশেষ করে শাহ নেওয়াজ, সাহগল ও ঢালওয়ানের মামলায় ভারতের এডভোকেট জেনারেল তাঁদের বিচার প্রার্থনা করে যে বক্তৃতা করেছিলেন তা মনোযোগ সহকারে পড়ার মতো। কেননা এ বক্তৃতায় সেই নামমাত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের যে আইনগত মর্যাদা ও অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে, মূলত সেটাই হলো সমস্ত আসল ও প্রকৃত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মহান রব্বুল আলামীনের রাজত্বের আইনগত মর্যাদা।—গ্রন্থকার

অবস্থায়ও আইনগত অবস্থান পূর্ববৎ থাকবে। 'দেশের জনগণই হচ্ছে সার্বভৌমত্বের মালিক এবং তারা আল্লাহর দেয়া আইনের বন্ধনমুক্ত থেকে নিজেরাই নিজেদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে'—যে রাষ্ট্রের ভিত্তি এ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত—ইসলামের দৃষ্টিতে সেই রাষ্ট্রের মর্যাদা হচ্ছে সম্পূর্ণ এরূপ যে, কোনো রাজার প্রজাবৃন্দ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার প্রতিকূলে নিজেদের সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করে নিল। এ বাদশাহর আইন যেভাবে এ রাষ্ট্রকে বৈধ বলে স্বীকার করতে পারে না, অনুরূপভাবে উল্লিখিত ধরনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আল্লাহর বিধান কখনো স্বীকৃতি দেয় না। এ ধরনের গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে যে বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, চাই তার বিচারক জাতিগত দিক থেকে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, তাদের ফায়সালাও ইসলামের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

ওপরে যাকিছু আলোচনা করা হলো তা সঠিক হওয়ার সপক্ষে গোটা কুরআনই দলীল। তথাপি প্রশ্নকারী যেহেতু কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে ব্যাখ্যা দাবি করেছেন তাই কুরআন মজীদ থেকে মাত্র কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে ঃ

এক ঃ কুরআনের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি তাঁরই। সুতরাং শাসন করার স্বাভাবিক অধিকার কেবল তাঁরই থাকবে। তাঁর রাজ্যে তাঁর সৃষ্টির ওপর স্বয়ং তিনি ছাড়া অন্য কারো আদেশ জারী হওয়া এবং কার্যকর হওয়া মূলতই গলদ।[৫০] মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ـ

"বলো, হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দান করো, আর যার কাছ থেকে চাও কেড়ে নাও।"
—সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ـ فاطر : ١٣

"তিনিই তোমাদের রব ; রাজত্ব তাঁরই।"—সূরা আল ফাতির ঃ ১৩

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ ـ بنى اسرئيل : ١١١

"তাঁর রাজত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই।"—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১

---

৫০. কিন্তু যদি কেউ তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা অর্জন করে তাঁর দেয়া আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা ও যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।—গ্রন্থকার

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ٥- المؤمن : ١٢

"সুতরাং হুকুম দেয়ার ক্ষমতা মহান আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ।"
–সূরা আল মু'মিন ঃ ১২

وَلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ٥- الكهف : ٢٦

"তিনি তাঁর সার্বভৌমত্বে কাউকে শরীক বানাননি।"–সূরা কাহ্ফ ঃ ২৬

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ- الاعراف : ٥٤

"সাবধান! সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও চলবে তাঁর।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪

يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط-

"লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হুকুম দেয়ার ব্যাপারে আমাদেরও কি কোনো অংশ আছে ? বলে দাও, নির্দেশ দেয়ার অধিকার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৪

দুই ঃ এ মূলনীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কেননা মানুষ হচ্ছে সৃষ্টি ও প্রজা, বান্দাহ এবং নির্দেশের অধীন। তার কাজ শুধু রাজাধিরাজ আল্লাহ যে আইন তৈরি করেছেন তার আনুগত্য করা।[৫১] তাঁর দেয়া আইনকে বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অথবা সংস্থা স্বয়ং আইন রচনা করে অথবা অন্য কারো রচিত আইনের স্বীকৃতি দিয়ে তদনুযায়ী ফায়সালা করে—সে তাগূত, বিদ্রোহী এবং সত্যের আনুগত্য থেকে বাইরে অবস্থানকারী। এ আইনের অধীনে ফায়সালা প্রার্থনাকারী এবং সেই ফায়সালা মান্যকারীও বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ-

---

৫১. আল্লাহর দেয়া বিধানের অধীনে মাসয়ালা বের করা এবং ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে ফিক্হশাস্ত্রের বিস্তারিত আইন রচনা করার ব্যাপারটি ভিন্ন জিনিস। এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে না। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দেননি, সেসব ক্ষেত্রে শরীয়তের প্রাণসত্তা এবং ইসলামের মেজাজের দিকে লক্ষ রেখে আইন প্রণয়নের অধিকার ঈমানদার লোকদের রয়েছে। কেননা এসব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকার সরাসরি অর্থ এই যে, এ সম্পর্কে আইন-কানুন ও নীতিমালা নির্ধারণ করার আইনগত অধিকার ঈমানাদর লোকদের দেয়া হয়েছে।–গ্রন্থকার

"তোমরা নিজেদের মুখে যেসব জিনিসের কথা উল্লেখ করো সে সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে একথা বলো না যে, এটা হালাল (Lawful) এবং এটা হারাম (Unlawful)।"–সূরা আন নাহল ঃ ১১৬

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط -

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যাকিছু নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো। তিনি ছাড়া অন্যান্য (নিজেদের বানানো কর্মকর্তা) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ - المائدة : ٤٤

"যেসব লোক আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা সবাই কাফের।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ -

"হে নবী! তুমি কি এসব লোকদের দেখোনি যারা তোমার ওপর নাযিলকৃত এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিলকৃত হেদায়াতের প্রতি ঈমান রাখার দাবি করছে ? পরে তারা তাগূতের মাধ্যমে নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফায়সালা করাতে চাচ্ছে। অথচ তাদেরকে তাগূতের (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ তাগূতের নির্দেশ না মানার হুকুম করা হয়েছে)।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬০

তিন ঃ মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য যে আইন-বিধান পাঠিয়েছেন তার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আল্লাহর যমীনে কেবল তাই সঠিক ও স্বীকৃত। এরই নাম হচ্ছে খিলাফত।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط - النساء : ٦٤

"আমরা যে রসূলই প্রেরণ করেছি কেবল এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর নির্দেশের অধীনে তাঁর আনুগত্য করতে হবে।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৬৪

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ ط -

"হে নবী! আমরা তোমার ওপর সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করেছি যেন তুমি লোকদের মাঝে আল্লাহর দেখানো নির্দেশের আলোকে ফায়সালা করতে পারো।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০৫

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط .... اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ط ـ

"আল্লাহ তাআলা যে হেদায়াত নাযিল করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মাঝে রাষ্ট্র পরিচালনা করো এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। সাবধান! তারা তোমাকে ফিতনা-ফাসাদে জড়িয়ে তোমার কাছে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকেও যেন তোমাকে হটিয়ে দিতে না পারে। .... তারা কি জাহিলিয়াতের রাজত্ব চায় ?"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৯-৫০

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ـ ص : ٢٦

"হে দাউদ! আমরা তোমাকে যমীনের বুকে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি ন্যায়ানুগভাবে মানুষের মাঝে রাজত্ব করো এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। অন্যথায় তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলা হবে।"–সূরা সোয়াদ ঃ ২৬

চার. পক্ষান্তরে যেসব রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রসূলদের আনীত বিধানের পরিবর্তে অন্য কোনো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা বিদ্রোহাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা বলেই গণ্য হবে। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থার ধরন যতই বিভিন্ন হোক না কেন, নির্বিশেষে এর সমস্ত কার্যক্রম ভিত্তিহীন এবং বাতিল বলে গণ্য। এর সরকার ও ফায়সালার জন্য মূলত কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ এদেরকে যখন কোনো সনদই দেননি তখন তা বৈধ রাষ্ট্র, বৈধ সরকার এবং বৈধ বিচারালয় কিভাবে হতে পারে ?[৫২] তারা যা কিছুই করে তা আল্লাহর বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য। ঈমানদার সম্প্রদায় (অর্থাৎ আল্লাহর

৫২. চার্টার বা সনদ বলতে আমাদের মতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে রাজাধিরাজ, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং নিজেকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি (সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়) বলে মেনে নেয়, নবী-রসূলদেরকে তাঁর রসূল ও আসমানী কিতাবকে তাঁর কিতাব বলে মেনে নেয় এবং শরীয়তে ইলাহীর অধীনে থেকে কাজ করে শুধু এ ধরনের রাষ্ট্র, সরকার ও বিচার ব্যবস্থাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সনদপ্রাপ্ত। স্বয়ং কুরআন মজীদে এ চার্টার দেয়া হয়েছে ঃ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহর নাযিলকৃত আইন-বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করো, ফায়সালা করো)।–গ্রন্থকার

বিশ্বস্ত প্রজা)-এর অস্তিত্বকে কার্যত একটি বাইরের ঘটনা হিসাবে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু একটি বৈধ ব্যবস্থাপনার উপায় এবং বৈধ বিচার ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারে না।

নিজেদের আসল মালিক ও আইনদাতা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের আনুগত্য করা তাদের কাজ নয় এবং এদের কাছে নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা প্রার্থনা করা নয়। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে ইসলাম ও ঈমানের দাবি করা সত্ত্বেও বিশ্বস্তদের (ঈমানদার) দল থেকে বহিষ্কৃত। কোনো রাষ্ট্র বা সরকার একটি গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী গণ্য করে, আবার নিজের প্রজাদের ওপর এই বিদ্রোহীদের আধিপত্যকে বৈধ বলে স্বীকারও করে এবং নিজের প্রজাদের এই সরকারের হুকুম মেনে নেয়ার অনুমতিও দেয়—এটা পরিষ্কারভাবেই বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝

"(হে মুহাম্মাদ!) তাদের বলো, আমরা কি তোমাদের বলবো নিজেদের কার্যকলাপের দিক থেকে সবচেয়ে ব্যর্থ কারা ? তারা হচ্ছে সেইসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আর তারা মনে করতে থাকে, তারাই সঠিক কাজ করছে। এরা সেই লোক, যারা নিজেদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে। এ কারণে তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ নিষ্ফল হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের কোনো গুরুত্বই দিব না।"

–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ১০৩-১০৫

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

"এ হলো 'আদ, যারা নিজেদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অমান্য করলো, তাঁর রসূলগণের বিরোধিতা করলো এবং সত্য দীনের প্রত্যেক প্রবল পরাক্রান্ত দুশমনের অনুসরণ করলো।"–সূরা হূদ ঃ ৫৯

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ - هود : ٩٦-٩٧

"আর মূসাকে আমরা নিজস্ব নিদর্শন ও সুস্পষ্ট সনদসহ ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা ফেরাউনের নির্দেশই মেনে নিল। অথচ ফেরাউনের নির্দেশ সত্যনির্ভর ছিল না।"

–সূরা হূদ ঃ ৯৬-৯৭

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ

"তুমি এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমরা আমার স্মরণ (অর্থাৎ আমি যে তার রব এ অনুভূতি) থেকে গাফিল করে দিয়েছি। আর যে ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে এবং যার কর্মনীতি সীমালংঘনমূলক, তারও অনুসরণ করো না।"

–সূরা কাহ্ফ ঃ ২৮

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا ـ الاعراف : ٣٣

"(হে নবী!) বলে দাও, আমার রব প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীল কার্যকলাপ, গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িকে হারাম করেছেন। আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকে শরীক মনে করবে যার সপক্ষে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি—এও তিনি হারাম করেছেন।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩৩

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ـ

"তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করো তা তো কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়—যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে দিয়েছো। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। হুকুম দেয়ার অধিকারী তো একমাত্র আল্লাহ। তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদাত করো না।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৪০

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا○

"কোনো ব্যক্তির সামনে সত্য পথ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পরও সে রসূলের বিরোধিতা করার জন্য কৃতসংকল্প হলে এবং মু'মিনদের বিপরীত পথের অনুসরণ করলে—আমরা তাকে সেদিকেই চালাবো যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। এটা খুবই নিকৃষ্ট স্থান।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১৫

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ - النساء : ٦٥

"না, হে মুহাম্মাদ ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা নিজেদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ

يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ○ - النساء : ٦١

"তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা সেদিকে এসো এবং রসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এ মুনাফিকদের তুমিও দেখতে পাবে—তারা তোমার কাছে আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬১

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً -

"আর আল্লাহ মুসলমানদের (অর্থাৎ নিজের বিশ্বস্ত প্রজাদের) ওপর কাফেরদের (অর্থাৎ নিজের রাজত্বে বিদ্রোহীদের) কোনো পথই অবশিষ্ট রাখেননি।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৪১

এগুলো হচ্ছে কুরআন মজীদের মুহকাম আয়াত।[৫৩] এসবের তাৎপর্যের মধ্যে কোনোরূপ সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। যে কেন্দ্রীয় আকীদা-

৫৩. শক্ত, পূর্ণাংগ ও মজবুত জিনিসকে 'মুহকাম' বলা হয়। 'মুহকাম আয়াত' বলতে যেসব আয়াতের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল, যার অর্থ নির্ধারণ করতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই, যার শব্দগুলোর অর্থ, ভাব এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, যেসব আয়াতের অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার ধুম্রজালে জড়ানোর সুযোগ কেউ খুব কষ্টেই পেতে পারে। এসব আয়াতই হচ্ছে কুরআনের মূল ভিত্তি অর্থাৎ কুরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা এ মুহকাম আয়াতের দ্বারাই পূর্ণ হয়। এসব আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়েছে, সাবধান-বাণী ও উপদেশের কথা বলা হয়েছে, গোমরাহীর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সত্য পথের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের আয়াতের মধ্যে দীনের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আকীদা-বিশ্বাস,

বিশ্বাসের ওপর ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি রাখা হয়েছে, তা যদি সংশয়পূর্ণ থেকে যেতো তাহলে কুরআন মজীদ নাযিল হওয়াই (মা'আযাল্লাহ) নিরর্থক হতো। এজন্য কুরআন মুহকাম আয়াতগুলোকে এত পরিষ্কার ভাষায় ও অকাট্যভাবে বর্ণনা করেছে যে, এর মধ্যে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের এরূপ সুস্পষ্ট ও ব্যাপক বর্ণনার পর হাদীস ও ফিক্‌হের দিকে রুজু করার আমাদের কোনোই প্রয়োজন নেই।

অতএব ইসলামের পূর্ণ ইমারতই যখন এ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ তাআলা যে জিনিসের জন্য কোনো সনদ নাযিল করেননি তা ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন, আর আল্লাহর সনদের মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যে জিনিসই কায়েম করা হয়েছে, তার আইনগত মর্যাদা সম্পূর্ণই বাতিল, তখন কোনো বিশেষ ব্যাপারে এটা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজনই থাকে না যে, এ ব্যাপারে কোনো আল্লাহহীন রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ফায়সালা শরীআতের দিক থেকে কার্যকর হতে পারে কি না ? যে শিশু হারাম বীর্যে পয়দা হয়েছে বলে স্বীকৃত তার সম্পর্কে এটা কি কখনও জিজ্ঞেস করা হয় যে, তার দেহ ও চুলও হারাম কি না ? শূকর যখন সম্পূর্ণই হারাম তখন এর এক টুকরা গোশত সম্পর্কে কখনো কি এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, এটা হারাম কি না ? সুতরাং বিবাহ বাতিল হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়া এবং তালাক অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে এ প্রশ্ন করা যে, ইসলাম বিরোধী আদালতের ফায়সালা কার্যকর হতে পারে কি না—এরূপ প্রশ্ন করা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণই বহন করে। এর চেয়েও বেশী অজ্ঞতার প্রমাণ এই যে, প্রশ্ন কেবল অমুসলিম বিচারকদের সম্পর্কেই করা হয়েছে। মনে হয় প্রশ্নকারীর মতে যে নামধারী মুসলমান ইসলাম বিরোধী আদালতের পরিচালক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে তার ফায়সালা তো কার্যকর হতে পারে বৈ কি ! অথচ শূকরের গোশতের টুকরার নাম বকরীর গোশতের টুকরা রেখে দেয়ায় তাতে ঐ টুকরাটি বাস্তবিকপক্ষে না বকরীর গোশতের টুকরায় পরিণত হতে পারে, আর না হালাল হতে পারে !

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

ইবাদাত, নৈতিকতা, দায়িত্ব, কর্তব্য ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানী এবং এটা জানার জন্য কুরআনের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চায় যে, সে কোন্ পথে চলবে এবং কোন্ পথে চলবে না—তার পিপাসা মেটানোর জন্য মুহকাম আয়াতগুলোই তার আশ্রয়কেন্দ্র। স্বভাবতই এসব আয়াতের ওপর তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হবে এবং এ থেকে সর্বাধিক উপকৃত হতে চেষ্টা করবে।–তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, সূরা আলে ইমরান ঃ ৫নং টীকা।–অনুবাদক

এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলামের এ মৌলনীতিকে মেনে নেয়ার পর আল্লাহবিরোধী রাষ্ট্র ও সরকারের অধীনে মুসলমানদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করার জন্য ইসলামের চিরন্তন মূলনীতির মধ্যে রদবদল তো করা যেতে পারে না। মুসলমানরা যদি অনৈসলামী রাষ্ট্রের অধীনে সহজতর উপায়ে জীবন যাপন করতে চায় তাহলে ইসলামের মূলনীতির মধ্যে রদবদল করা বা অন্য কথায় ইসলামকে অনৈসলাম বানানোর অধিকার তাদের নেই। অবশ্য মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হওয়ার সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো কোনো জিনিস নেই। উৎসাহের সাথে ইসলাম পরিত্যাগ করে জীবন যাত্রার কোনো সহজ পথ তারা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা যদি মুসলমান হয়ে থাকতে চায় তাহলে তাদের জন্য সঠিক ইসলামী পন্থা এটা নয় যে, অনৈসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার জন্য সহজ পন্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমন কূটকৌশল ও বাহানা খুঁজে বেড়াবে যা ইসলামের মৌলনীতির সাথে সংঘর্ষশীল, বরং তাদের জন্য একটি রাস্তাই খোলা আছে। আর তা হচ্ছে, তারা যেখানেই থাকুক, রাষ্ট্র ও সরকারের দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করার এবং রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতিকে সংশোধন করার চেষ্টা-সাধনায় নিজেদের সমস্ত শক্তি খরচ করুক।

❒

পরিশিষ্ট-২

পাশ্চাত্য সমাজে তালাক ও বিচ্ছেদের আইন

تُعْرَفُ الْاَشْيَاءُ بِاَضْدَادِهَا –"কোনো বস্তুকে তার বিপরীত বস্তু দ্বারাই চেনা যায়।" পিছনের পাতাগুলোতে ইসলামের দাম্পত্য আইনের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা দেখে এ আইনের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে অনুমান করা যাবে না, যতক্ষণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এর বিপরীতমুখী আইন সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়ন করা না হবে। কেননা বর্তমানে এটাকে উন্নত আইন ব্যবস্থা বলে দাবি করা হচ্ছে। এ তুলনামূলক অধ্যয়ন থেকে এটাও জানা যাবে যে, আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত ও পথনির্দেশকে উপেক্ষা করে মানুষ নিজেই যখন নিজের আইনপ্রণেতা হয়ে বসে তখন সে কি পরিমাণ হোঁচট খেতে থাকে।

ইসলামী আইনের বিশেষত্বসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হচ্ছে—এর মূলনীতি ও বুনিয়াদী নির্দেশসমূহের মধ্যে এর প্রান্তসীমা পর্যন্ত সমতা, ইনসাফ ও ভারসাম্য বিদ্যমান। একদিকে তা নৈতিকতার উন্নততর লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখে, অপরদিকে মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতাকেও উপেক্ষা করে না। একদিকে তা সামাজিক তথা সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ রাখে, অপরদিকে ব্যক্তির অধিকারকেও পদদলিত হতে দেয় না। একদিকে তা বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ রাখে, অপরদিকে এমন কোনো সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয় না যা কোনো এক সময় বাস্তব জগতে ঘটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। মোটকথা, এটা এমনই এক ভারসাম্যপূর্ণ আইন ব্যবস্থা, যার কোনো নীতি ও নির্দেশের মধ্যে বাড়াবাড়ির কোনো প্রবণতা নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যতগুলো দিকের প্রতি লক্ষ রাখা প্রয়োজন, ইসলাম সেসব দিকে কেবল দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, বরং বাস্তব ক্ষেত্রেও পূর্ণরূপে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এর মাঝে এতটা সঠিক ভারসাম্য স্থাপন করেছে যে, কোনো একদিকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা ঝুঁকে পড়েনি এবং অন্যদিককে উপেক্ষাও করেনি। এ কারণেই আজ তের শত বছর ধরে এ আইন ব্যবস্থা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, জ্ঞান-গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এবং ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জাতির মধ্যে কার্যকর ছিল। কোথাও কোনো ব্যক্তিগত অথবা সামষ্টিক অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন এর কোনো বুনিয়াদী নির্দেশকে ভ্রান্ত

অথবা সংশোধনযোগ্য পায়নি। শুধু তাই নয়, মানবীয় চিন্তা আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এর কোনো একটি অংশের এমন কোনো বিকল্প চয়ন করতে সফল হয়নি যা ন্যায়-ইনসাফ, ভারসাম্য ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে এর কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারে।

ইসলামী আইনের মধ্যে এই যে গুণ-বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তা শুধু মহান আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও দূরদর্শিতারই ফল। মানুষ তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিবন্ধকতা ও স্বভাবগত সীমাবদ্ধতার কারণে কখনো কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে এর সার্বিক দিক আয়ত্তে আনতে সক্ষম হতে পারে না। বর্তমান-ভবিষ্যতের ওপর সে সমানভাবে নজর রাখতে সক্ষম নয়। কাজ ও শক্তির ওপর সমান দৃষ্টি দিয়ে, স্বয়ং নিজের ও অন্য সব মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির প্রকাশ্য ও গোপন বিশেষত্বের পূর্ণ বিবেচনা করে, নিজের পারিপার্শ্বিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে, নিজের আবেগ-প্রবণতা, ঝোঁক ও জ্ঞানগত দুর্বলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ পাক হয়ে এমন কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়, যা সর্বাবস্থায় সর্বযুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিকরূপে আদল-ইনসাফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

এ কারণে যেসব আইন মানবীয় চিন্তার ওপর ভিত্তিশীল, তার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য পাওয়া যায় না। কোথাও দৃষ্টিভংগীর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়, কোথাও মানবীয় স্বভাবের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা দেখা যায়, কোথাও মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করার বেলায় ইনসাফ করা হয় না, কোথাও ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সীমা নির্ধারণ ও অধিকার বণ্টনে বে-ইনসাফী করা হয়। মোটকথা, প্রতিটি নতুন অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং প্রতিটি যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব মস্তিষ্কপ্রসূত এসব আইনের দুর্বলতা দিবালোকের মত প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এর ফলে মানুষ এসব মনগড়া আইনের রদবদল করতে অথবা বিশ্বাসগত দিক থেকে এর অনুগত থেকেও কার্যত এর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি লাভ করতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও মানব রচিত আইনের মধ্যে এ মৌলিক পার্থক্য আজও এতটা প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে যে, অন্ধ ও রাতকানা ব্যক্তি ছাড়া সবাই-ই তা দেখতে পায়। গতকাল পর্যন্তও গোঁড়ামি অথবা মূর্খতার কারণে ইসলামী আইনের যেসব নির্দেশ ও মূলনীতির ওপর বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করা হতো এবং এর মোকাবিলায় মানব রচিত আইনের যে দর্শন ও নীতিমালা নিয়ে গর্ব করা হতো—আজ সে সম্পর্কেই কোনো বিতর্ক ও যুক্তি-প্রমাণ

ছাড়াই শুধু বাস্তব ঘটনার অনস্বীকার্য সাক্ষ থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং হয়ে চলেছে যে, ইসলাম যা কিছু শিখিয়েছিল তা-ই সঠিক ছিল। এর মোকাবিলায় মানব রচিত আইন যতগুলো পথই স্থির করেছিল তা সবই ভ্রান্ত ও অনুসরণের অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। যদিও কল্পনার জগতে তা খুবই উজ্জ্বল মনে হয় এবং জিহ্বা আজো তার অকৃতকার্যতার স্বীকৃতি দিতে রাজী নয়, কিন্তু কার্যত দুনিয়া এসব আইনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে যাকে গতকাল পর্যন্তও সে নেহায়েত পবিত্র জ্ঞান করতো এবং সংশোধনের উর্ধে মনে করতো। আস্তে আস্তে দুনিয়া ইসলামের নির্ধারিত মূলনীতি ও আইন-কানুনের দিকে ফিরে আসছে, কিন্তু তা অনেক অঘটন ঘটানোর পরে।

উদাহরণস্বরূপ তালাকের প্রসংগটিই ধরা যেতে পারে। এ কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্তও তালাকের ওপর খৃস্টান জগত মুসলমানদের কত না বিদ্রূপ করতো এবং বহু প্রভাবান্বিত মুসলমান লজ্জায় মরে গিয়ে এর প্রত্যুত্তর করতে পারতো না। কিন্তু দেখতে দেখতে বাস্তব ঘটনাবলী প্রমাণ করে দিল যে, স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক ছিন্ন করা অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করা এবং আইনের মধ্যে তালাক, খোলা, বিবাহ বাতিল ও ছিন্ন করার ব্যবস্থা না রাখা খৃস্টানদের কোনো যৌক্তিক কাজ ছিল না, বরং এটা মানবীয় চিন্তার ভারসাম্যহীনতারই ফল। এর মধ্যে নৈতিক চরিত্র, মানবতা ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, বরং ধ্বংসের উপকরণই লুকিয়ে আছে। হযরত ঈসা আ.-এর একথা কত চমৎকার ছিল ঃ "আল্লাহ যাদের জোড় বেঁধেছেন, মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করে।"–মথি ১৯ ঃ ৬।

কিন্তু খৃস্টানরা নবীর একথার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলো এবং এটাকে নৈতিক পথনির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করার পরিবর্তে দাম্পত্য আইনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলো। পরিণাম কি হলো ? খৃস্টান জগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাস্তব ক্ষেত্রে অনুপযোগী এ আইনের বিরুদ্ধে কূটকৌশল, ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে থাকলো। অতপর আইন অমান্য করার বদ অভ্যাস এতটা উন্নতি লাভ করলো যে, দাম্পত্য সম্পর্কের চেয়েও অধিক পবিত্র ছিল যে নৈতিক সীমারেখা তাও তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে লংঘন করতে থাকলো। অবশেষে লোকেরা বাধ্য হয়ে এ আইনে কিছুটা আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ সংশোধন আনয়ন করে। ভুলবশত এটাকে তারা খোদায়ী আইন মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু এ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ তখনই নেয়া হয়েছে যখন আইন অমান্য করার অভ্যাস ঈসা আ.-এর অনুসারীদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত কোনো জিনিসের প্রতিই শ্রদ্ধাবোধ

অবশিষ্ট রাখেনি। ফল হলো এই যে, এ আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ সংশোধনের মাধ্যমে খৃস্টান বিশ্বে তালাক, বিবাহ বাতিল ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এক মহাপ্লাবন শুরু হয়ে গেল। এর বিভীষিকায় পারিবারিক ব্যবস্থার পবিত্রতম প্রাচীর খান খান হয়ে যেতে থাকলো। ইংল্যাণ্ডে ১৮৭১ সনে যেখানে মাত্র ১৬৬টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, ১৯৩৩ সনে সেখানে চার হাজারেরও অধিক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে অর্থাৎ আল্লাহর জুড়ে দেয়া প্রতি ৭৯টি সম্পর্কের মধ্যে মানুষ একটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমেরিকায় ১৮৮৬ সনে যেখানে ৩৫ হাজার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল, ১৯৩১ সালে সেখানে ১ লাখ ৮৩ হাজার পবিত্র সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে। ফ্রান্সে তো এখন প্রায় প্রতি ১৫টি বিবাহের মধ্যে একটির শেষ পরিণতি হয় তালাক। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের অবস্থাও কমবেশী এরূপ।

হযরত মসীহ আ. যে শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রায় অনুরূপ শিক্ষা কুরআন মজীদেও পাওয়া যাচ্ছে। কুরআনের বাণী ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ص وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সুদৃঢ় করে নেয়ার পর তা ভংগ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক জুড়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, প্রকৃতপক্ষে এরা ক্ষতিগ্রস্ত।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭

মসীহ আ. ইহুদীদের পাষাণ হৃদয়বৃত্তি ও তালাকের আধিক্যের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ "ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে"–(মথি ১৯ ঃ ৯)। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উদ্দেশ্যে এর চেয়েও অধিক মাপাজোকা ভাষায় তালাককে ابغض المباحات (সর্বাধিক ঘৃণ্য বৈধ কাজ) বলেছেন এবং কুপ্রবৃত্তি চর্চার উদ্দেশ্যে তালাক দানকারীদের অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু নৈতিকতার এ উচ্চতর মূলনীতি ছিল শুধু লোকদের শিক্ষার জন্য, যেন তারা নিজেদের কাজকর্মে তা সামনে রাখে। এটাকে হুবহু গ্রহণ করে তা একটি আইনে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু চরিত্র গঠনের শিক্ষকই ছিলেন না, বরং শরীয়ত

প্রণেতাও ছিলেন। এজন্য তিনি নৈতিকতার মূলনীতি বর্ণনা করার সাথে সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, আইনের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণের সঠিক গড় কি হওয়া উচিত এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির দাবির মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে। পক্ষান্তরে মসীহ্ আলাইহিস সালাম শরীয়ত প্রণেতা ছিলেন না, বরং শরীয়তের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ আসার পূর্বেই দুনিয়াতে তাঁর নবুওয়াতী মিশনের সমাপ্তি ঘটেছিল। এজন্য তাঁর বাণীর মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রাথমিক মূলনীতিগুলো ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। জীবনের বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতির সামঞ্জস্য বিধান করা যেত এবং তা মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তের আলোকেই হতে পারতো। কিন্তু খৃস্টানরা মনে করলো এবং সেন্ট পল তাদেরকে বুঝালো যে, মূলনীতি পেয়ে যাওয়ার পর এখন আমরা শরীয়তে ইলাহীর মুখাপেক্ষীহীন হয়ে গেছি এবং এখন এ মূলনীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাজ নয়, বরং চার্চের দায়িত্ব।

তাদের বোধশক্তির এ চরম ভ্রান্তি চার্চ ও তার অনুসারীদের চিরকালের জন্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। খৃস্টানদের দুই হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ দেয় যে, সাইয়েদিনা মসীহ্ আলাইহিস সালাম দীনের যতগুলো মূলনীতি বলে দিয়েছেন তার কোনো একটি মূলনীতির ভিত্তিতেই সঠিক আইন রচনা করার ক্ষেত্রে চার্চ কৃতকার্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত খৃস্টান জাতি এসব মূলনীতি থেকে বিপথগামী হতে বাধ্যও হয়েছে।

মসীহ্ আ. তালাকের যে সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে 'যেনায় লিপ্ত হওয়া' কথাটিকে ব্যতিক্রম করে সম্ভবত এদিকে ইশারা করেছিলেন যে, তালাক সাধারণত খারাপ জিনিস নয়, বরং বৈধ। কারণ ছাড়া তালাক দেয়া ঘৃণিত ব্যাপার। খৃস্টানরা তাঁর একথা বুঝতে সক্ষম হয়নি এবং এটাকে 'আল্লাহ্ যাদের জোড়া বেঁধেছেন, মানুষ যেন তা ছিন্ন না করে' আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল মনে করে কেউ কেউ তো সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে যে, 'যেনায় লিপ্ত হওয়া' কথাটি পরবর্তী কালে আয়াতের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ মাসয়ালা বের করলো যে, স্ত্রীর যেনায় লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীকে তো পৃথক করে দিতে হবে, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থেকে যাবে। অর্থাৎ দুজনের কেউই পুনর্বিবাহের অনুমতি পাবে না। শত শত বছর ধরে খৃস্টান জগত এভাবেই কাজ করে আসছে। মোটকথা, অন্যান্য আইনের মতো এ আইনও খৃস্টান জাতির মধ্যে চরিত্রহীনতা ও অশ্লীলতার মহামারী ছাড়ানোর ব্যাপারে অনেকখানি দায়ী।

১০—

মজার ব্যাপার হচ্ছে, গির্জার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের দাবি করা সত্ত্বেও বৃটেন ও আমেরিকার মত দেশসমূহে আজ পর্যন্ত আইনানুগ বিচ্ছেদের (Judicial Separation) অর্থ এই মনে করা হয় যে, স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দিতে হবে। কিন্তু তাদের কেউই দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে না। এ হচ্ছে মানব-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার পরিণাম। রোমান চার্চের ধর্মীয় আইনে (Canon Law) উপরিউক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে যে আইন তৈরি করা হয়েছিল তার আলোকে তালাক (Divorce) অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়, পরে স্বামী ও স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে বিবাহ করার অধিকার অর্জিত হয়—তা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য বিচ্ছেদের জন্য ছটি শর্ত স্থির করা হয়েছিল ঃ

১. যেনা অথবা অস্বাভাবিক অপরাধ,

২. পুরুষত্বহীনতা,

৩. নির্যাতনমূলক আচরণ,

৪. অবাধ্যাচরণ,

৫. ধর্মত্যাগ,

৬. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন রক্তের সম্পর্ক উদ্‌ঘাটিত হওয়া, যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া আইনত নিষিদ্ধ (অর্থাৎ মুহরিম আত্মীয়)।

এ ছয়টি শর্তের ক্ষেত্রে যে আইনগত সমাধান নির্ণয় করা হয়েছিল তা হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটাবে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সমাধানকে যুক্তিসংগত বলতে পারেন ? মূলত এটা কোনো আইনানুগ সমাধানই ছিল না, বরং এটা ছিল একটা শাস্তি, যার ভয়ে লোকেরা বিচ্ছেদের মোকদ্দমা নিয়ে আদালতে যেতেই সাহস পেতো না। বিচারের কষাঘাতে যদি কোনো দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যেতো তাহলে তাদেরকে পাদ্রীদের মতো বৈরাগীর জীবন যাপন করতে হতো।

এ নিষ্ঠুর অবাস্তব আইনের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য খৃস্টান পাদ্রীরা অসংখ্য কূটকৌশল আবিষ্কার করে রেখেছিল। তার সুযোগ গ্রহণ করে গির্জার আইন এ ধরনের হতভাগ্য স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বাতিল করে দিতো। মোটকথা তাদের একটি ধোঁকাবাজি ছিল এই যে, যদি কোনোভাবে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, স্বামী-স্ত্রী আজীবন একত্রে বসবাস করার যে অংগীকার করেছিল

তা অনিচ্ছায় তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, অন্যথায় কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুত'আ (متعه) বিবাহ এ অবস্থায় গির্জাভিত্তিক আদালত বিবাহ বাতিলের (Nullity) ঘোষণা দেবে। কিন্তু খৃস্টীয় আইনের দৃষ্টিতে 'বিবাহ বাতিলে'র অর্থ কি ? এর অর্থ হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিবাহই হয়নি, এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং এর ফলে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে সে জারজ সন্তান। এ অর্থের দিক থেকে আইনের এ দ্বিতীয় সমাধানটি ছিল প্রথমটির চেয়ে আরো অধিক অপমানকর।

পক্ষান্তরে রোমান চার্চের তুলনায় পূর্বাঞ্চলীয় গির্জা (Orthodox Eastern Church), যা ইসলামী ফিকহের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছ—একটি উত্তম ও কার্যক্ষম আইন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এ গির্জার মতে নিম্নলিখিত কারণে স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে ঃ

১. যেনা-ব্যভিচার ও এর প্রাথমিক উপকরণসমূহ, ২. ধর্মত্যাগ, ৩. স্বামীর জীবনকে পাদ্রী হিসাবে ধর্মের সেবায় ওয়াক্ফ করে দেয়া, ৪. অবাধ্যাচরণ, ৫. বিদ্রোহ, ৬. নপুংসক, ৭. উন্মাদ, ৮. কুষ্ঠ ও ধবল, ৯. দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্দী হওয়া, ১০. পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ অথবা উভয়ের মেজাজ ও স্বভাবের চরম অমিল।

কিন্তু পাশ্চাত্যের ধর্মীয় নেতারা এ আইন মানে না। তারা রোমান চার্চের ফিক্হের ওপর ঈমানকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছেন যার মধ্যে চূড়ান্তভাবে এ সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যু ছাড়া আর কোনো কিছুতেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হতে পারে না। এখন এ ফতোয়ার পর তাদের বুদ্ধি খাটানো তো দূরের কথা, স্বয়ং নিজেদের ধর্মের অপর একটি মাযহাবের ফিক্হ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও হারাম। ১৯১২ সালে রয়েল কমিশনের সামনে বিশপ গোর (Bishop Gore) প্রাচ্যের গির্জার ফিক্হ থেকে কোনো কোনো ব্যাপারে আইন গ্রহণ করার বিরোধিতা শুধু এ যুক্তিতে করেছেন যে, বৃটিশ চার্চ রোমান চার্চের ফিক্হের অনুসারী। ১৯৩০ সালের ল্যামবেথ সম্মেলনে (Lambeth Conference) পরিষ্কার ভাষায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, 'আমরা এমন কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের বিবাহ পড়াতে পারি না—যার প্রাক্তন স্বামী অথবা স্ত্রী এখনো জীবিত রয়েছে।' সর্বশেষ সংশোধন, যার ওপর ১৯৩৫ সালে ইংল্যান্ডের ধর্মীয় নেতাদের একটি সম্মেলন (Joint Committee of Convocation) ঐকমত্য পোষণ করেন, তা হচ্ছে 'বিবাহের পূর্বে যদি কোনো পক্ষ ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হয় অথবা স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্তা

হয় এবং বিবাহের সময় স্বামীর কাছে তা গোপন রাখে তাহলে বিবাহ বাতিল করা যেতে পারে।' এর অর্থ হচ্ছে, যদি বিবাহের পর এ ধরনের কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়, তাহলে স্ত্রীর জন্যও ধর্মীয় দিক থেকে উপায় নেই এবং স্বামীর জন্যও মুক্তির কোনো পথ নেই।

এতো ছিল ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবস্থা, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একাধারে বড় বড় আলেম ফিক্‌হবিদের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মসীহ্‌ আলাইহিস সালাম-এর একটি বাণীর তাৎপর্য ও আইনগত মর্যাদা অনুধাবন করতে তাদের ধর্মীয় নেতাদের যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, তার প্রভাব এদের মন-মগজে এমন গভীরভাবে জমে গিয়েছে যে, যুগের পরিক্রমা, অবস্থার পরিবর্তন, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও বিবর্তন, মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির অধ্যয়ন, শত শত বছরের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন, স্বয়ং বুদ্ধি-বিবেকের ফায়সালা এবং আইন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত—মোটকথা এসব জিনিস মিলেও তাদেরকে এ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারেনি। হাজার বছর দীর্ঘ সময়েও রোমান চার্চের সর্বোত্তম মস্তিষ্কগুলো নিজেদের আইনে ভারসাম্য আনয়ন করতে এবং তাকে ন্যায়-ইনসাফের সঠিক নকশার ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি।

এখন স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী এবং প্রশস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আধুনিক আইন প্রণেতাদের অবদানের ওপর কিছুটা দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক, যারা ধর্মীয় আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বয়ং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির সহায়তায় নিজ নিজ জাতির জন্য দাম্পত্য আইন রচনা করেছে।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের অধিকাংশ দেশে রোমান চার্চের ধর্মীয় আইন কার্যকর ছিল এবং তা একই ধরনের অন্যান্য আইনের সাথে মিলিত হয়ে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের সমাজ ও তাদের চরিত্রকে চরম অবক্ষয়ের মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। বৈপ্লবিক যুগে যখন স্বাধীন সমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার হাওয়া বইতে লাগলো, তখন ফরাসী জাতিই সর্বপ্রথম নিজেদের আইনের ত্রুটি ও অপূর্ণতা অনুধাবন করলো। তাদের পাদ্রী সমাজ কোনোক্রমেই এ আইন সংশোধন করতে প্রস্তুত নয়—এটা লক্ষ করে তারা ধর্মের জোয়াল সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কাঁধ থেকে নিক্ষেপ করলো (১৭৯২ খৃ.)। এরপর একই হাওয়া অন্যান্য দেশেও বইতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে বৃটেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও ধর্মীয় আইনকে পরিত্যাগ করে নিজ নিজ জাতির জন্য পৃথকভাবে বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন রচনা করে নিল। এর

মধ্যে আইনানুগ বিচ্ছেদ ও বিবাহ বাতিলের ব্যবস্থা ছাড়াও তালাকের সুযোগও রাখা হলো।

এভাবে খৃস্টান জাতিসমূহের এক বিরাট অংশের নিজেদের ধর্মীয় আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া খৃস্টান পাদ্রীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী, অজ্ঞতা ও গোঁড়ামিরই ফল। তারা নিজেদের গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে একটি অকার্যকর, স্বভাব বিরোধী ও মারাত্মক ক্ষতিকর আইনকে কেবল ধর্মের নামে জোরপূর্বক জনগণের ওপর চাপিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এ আইন আল্লাহর তৈরি আইন ছিল না, শুধু গুটিকয়েক ব্যক্তির ইজতিহাদের ভিত্তিতে রচিত ছিল। কিন্তু খৃস্টান পাদ্রীরা এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের মত পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় বলে স্থির করলো। তারা এর প্রকাশ্য ভ্রান্তি, অনিষ্টকারিতা ও বিবেক-বুদ্ধি-বিবর্জিত বিষয়গুলো দেখতে ও অনুধাবন করতে শুধু এ কারণেই চরমভাবে অস্বীকার করলো যে, কোথাও সেন্ট পল এবং অমুক অমুক প্রাচীন পাদ্রীর আবিষ্কৃত মাসয়ালা ভুল হওয়ার সম্ভাব্যতাকে মেনে নিলে হয়ত ঈমান চলে যেতে পারে! এমনকি নিজেদের ধর্মের অন্তরগত অন্যান্য ফিকহী মাযহাবের সহায়তা গ্রহণ করারও তারা বিরোধিতা করলো। পাশ্চাত্য চার্চের আইন-কানুন প্রাচ্য চার্চের তুলনায় অধিক উত্তম—একথার ভিত্তিতে কিন্তু বিরোধিতা হয়নি, বরং বিরোধিতা হয়েছে শুধু এ কারণে, 'আমরা পাশ্চাত্য চার্চের অনুসারী!' ধর্মীয় নেতাদের এহেন কর্মপন্থা পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের জন্য এ ধরনের আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এটাকে দূরে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো পথ অবশিষ্ট রাখেনি। কেননা এর অনিষ্টকারিতা ও ভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়ার পরও তা সংশোধনযোগ্য বিবেচনা করা হয়নি।

এক দাম্পত্য বিধানের ওপরই বা কতটুকু দোষ চাপানো যায়? মূলত এ পাদ্রীসুলভ মানসিকতাই ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যের জাতিসত্তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ধর্মবিমুখতা, ধর্মহীনতা, ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার দিকে নিয়ে গেছে।

ধর্মীয় আইনের বন্ধন থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে গত সত্তর-আশি বছরের মধ্যে যে দাম্পত্য আইন প্রণীত হয়েছে, তা রচনা করতে যদিও হাজার হাজার ও লাখ লাখ মেধা নিজেদের সর্বোত্তমরূপে নিয়োজিত করেছে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমাগতভাবে রদবদল ও সংশোধন করে আসছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আরবের এক

নিরক্ষর নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের পেশকৃত আইনের মধ্যে যে ভারসাম্য ও ন্যায়-ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে তা তাদের রচিত আইনের মধ্যে কখনো সৃষ্টি হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তারা ধর্মীয় আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েও নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে রোমান চার্চের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনকারীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণা থেকে আজো পবিত্র করতে পারেনি।

উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের আইনকেই নিন। ১৮৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে শুধু যেনা ও নির্যাতনমূলক আচরণকে এমন দুটি কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হতো যার ভিত্তিতে আইনগতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের ফায়সালা দেয়া হতো। তালাক সংঘটিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অন্যত্র বিবাহ করার জন্য আযাদ হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে এটা তখনো নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ সালের আইনে উল্লিখিত দুটি কারণের সাথে ঈলা (Desertion)-কেও বিচ্ছেদের একটি বৈধ কারণ হিসাবে সংযুক্ত করা হয়। তবে শর্ত হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে আলাদা থাকার সময়সীমা দু বছর বা ততোধিক হতে হবে। উপরন্তু এ আইনে তালাককেও (বিবাহ বন্ধন থেকে চূড়ান্ত মুক্তি) বৈধ করা হয়েছে। তবে এর জন্য শর্ত রাখা হয়েছে, স্বামীকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে, নিজে সরাসরি তালাক দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীর জন্যও এটা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে যে, সে যদি তালাক দাবি করে তাহলে পারিবারিক পর্যায়ে স্বামীর কাছে তা দাবি করতে পারবে না, বরং যে কোনো অবস্থায় তাকেও আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।

অতপর আদালতের জন্যও তালাকের ডিক্রী (Decree) দেয়ার মাত্র একটি পন্থাই রাখা হয়েছে। তা হচ্ছে, স্বামী যদি তালাক চায় তাহলে তাকে 'স্ত্রী যেনায় লিপ্ত হয়েছে' বলে প্রমাণ করতে হবে। আর যদি স্ত্রী তালাক চায় তাহলে তাকেও 'স্বামী যেনায় লিপ্ত হয়েছে' এটা প্রমাণ করার সাথে সাথে তার ওপর স্বামীর অমানুষিক আচরণ অথবা নির্যাতনের ব্যাপারটিও প্রমাণ করতে হবে। এভাবে যেন পুরুষ ও নারীকে বাধ্য করা হচ্ছে, তারা যে কোনো কারণেই হোক একে অপরকে ত্যাগ করতে চাইলে একজনকে অপরজনের ওপর যেনার অপবাদ অবশ্যই লাগাতে হবে এবং প্রকাশ্য আদালতে তার প্রমাণ পেশ করে চিরকালের জন্য সমাজের একজন সদস্যের জীবনকে কলংকময় করে দিতে হবে।

এ আইন এভাবে যেনার মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করানোর একটি দরজা খুলে দিয়েছে। বিচারালয়কে সমাজের সমস্ত দুর্গন্ধময় কাপড় পরিষ্কার

করার ধোপাখানায় পরিণত করা হয়েছে। তাছাড়া আদালত থেকে তালাকের মোকদ্দমা প্রচার যেন নির্লজ্জ চরিত্রহীনতা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হয়ে গেছে। উপরন্তু এ আইন স্বামীদের দায়ূস (دیوث)[৫৪] হওয়ার প্রশিক্ষণও দিল। কেননা এ আইনে স্বামীদের অধিকার দেয়া হলো যে, তারা যদি চায় তাহলে নিজ নিজ স্ত্রীর প্রেমিকদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে—ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ স্ত্রীর সতীত্ব বিক্রির বিনিময়ে ! অবৈধ মিলনের আর্থিক মূল্য—যা নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষের ভোগে প্রদান করার মাধ্যমে উপার্জিত হয়।

১৮৮৬ সালের আইনে আদালতকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে যে, আদালত ইচ্ছা করলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার সাথে সাথে অপরাধী স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বোঝাও চাপাতে পারে। ১৯০৭ সালের আইনে স্বামীর অপরাধী হওয়ার শর্ত তুলে দেয়া হয় এবং আদালতকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার দেয়া হয় যে, আদালত যেখানে উচিত মনে করবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তালাকদাতা স্বামীর ওপর চাপাতে পারবে। এটা হচ্ছে প্রকাশ্যতই নারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এখানে পরিষ্কারভাবেই ভারসাম্যহীনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন কোনো সম্পর্কই অবশিষ্ট থাকলো না তখন শুধু পূর্বেকার সম্পর্কের ভিত্তিতে একজন ভিন্ন নারীকে একজন ভিন্ন পুরুষের কাছ থেকে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দেয়া যুক্তির বিচারেও ঠিক নয়, আর এটাকে ইনসাফের ওপর ভিত্তিশীলও বলা যায় না। কেননা পুরুষ তার কাছ থেকে বিনিময়স্বরূপ কিছুই পাচ্ছে না।

১৮৯৫ সালের আইনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, স্ত্রী যদি স্বামীর যুলুম-অত্যাচারের কারণে তার সংসার ত্যাগ করে চলে যায় এবং তার থেকে পৃথক বসবাস করে, তাহলে আদালত স্বামীকে তার কাছে যেতে বাধা দিবে, তাকে নিয়ে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে এবং বাচ্চাদেরও স্ত্রীর কাছে রাখার অধিকারী সাব্যস্ত করবে। এ আইনে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা তার অনীহা ও উপেক্ষার কারণে যেনায় লিপ্ত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে স্বামীর তালাকের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

একথার অর্থ সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা করুন। স্বামীর নির্যাতন প্রমাণ করে স্ত্রী তার থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। স্বামীকে তার কাছেও ভিড়তে দেয়া হচ্ছে

---

৫৪. 'দায়ূস'—অসতী স্ত্রীর স্বামী, ব্যভিচারের দূত ; যে পুরুষ গোপন প্রণয়ের নায়ক-নায়িকার মিলন সংসাধন করে।—অনুবাদক

না, অথচ ভরণ-পোষণের অর্থ তার কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে এবং সে প্রেমিকদের কাছ থেকে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করছে ! আবার স্বামী যদি এ ধরনের স্ত্রীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়—তাহলে এটাও সম্ভব নয়। এ হচ্ছে সেই দাম্পত্য আইন—যা উনিশ শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডের সর্বোৎকৃষ্ট মস্তিষ্কগুলো পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রচনা করেছে !

১৯১০ সালে তালাক ও দাম্পত্য বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন দীর্ঘ তিন বছরের পরিশ্রমের পর ১৯১২ সালের শেষ দিকে নিজেদের রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টে যেসব পরামর্শ পেশ করা হয় সেগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. তালাকের কারণগত দিক থেকে পুরুষ ও নারী উভয়কে এক সমান সাব্যস্ত করতে হবে এবং যেসব কারণের ভিত্তিতে পুরুষ তালাকের ডিক্রী পাওয়ার অধিকারী হয়—অনুরূপ কারণের ভিত্তিতে নারীকেও তালাক লাভ করার অধিকারী সাব্যস্ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ স্বামী যদি একবারও যেনায় লিপ্ত হয় তাহলে স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক আদায় করতে পারবে।

২. তালাকের পূর্বোল্লেখিত কারণগুলোর সাথে নিম্নলিখিত কারণগুলোও সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

ক. একাধারে তিন বছর আলাদা ফেলে রাখা, খ. দুর্ব্যবহার, গ. চিকিৎসার অযোগ্য রোগ, ঘ. উন্মাদনা—এ অবস্থায় পাঁচ বছর অতীত হওয়া, ঙ. এতটা মাদকাসক্তি যে, তা ছাড়ার কোনো আশা নেই[৫৫] এবং চ. মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করে যে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

৩. মদকাসক্তির কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিন বছরের জন্য বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। এ সময়সীমার মধ্যে যদি এ কুঅভ্যাস দূর না হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তালাকের ডিক্রী লাভ করার অধিকারী হবে।

৪. বিবাহের পূর্বে যদি কোনো পক্ষের উন্মাদনা অথবা ঘৃণিত কোনো রোগ হয়ে থাকে এবং তা অপর পক্ষের কাছে গোপন রাখা হয় অথবা স্ত্রীলোকটি যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে এবং সে তার এ গর্ভের কথা গোপন রেখে থাকে, তবে এটাকে বিবাহ বাতিলের উপযুক্ত কারণ বলে সাব্যস্ত করা হবে।

---

৫৫. পাশ্চাত্য পরিভাষায় 'মাদকাসক্তি'র অর্থ অভ্যাসগতভাবে মদ্যপান নয়, বরং সীমাতিরিক্ত-মদ্যপান করে মারপিট, ঝগড়াঝাটি, চিৎকার, হৈ-হুলোড় ও গালি-গালাজ করা এবং প্রকাশ্য দিবালোকে অর্থহীন প্রলাপ, অশ্লীল বাক্য ব্যবহার এবং পাগলের মতো কার্যকলাপ করা।
—গ্রন্থকার

৫. তালাকের মামলা চলাকালে তালাকের রিপোর্ট প্রকাশ করা যাবে না এবং পরবর্তীকালে আদালত মামলার কার্যবিবরণীর যে অংশ প্রকাশ করার অনুমতি দিবে, শুধু সেই অংশ প্রকাশ করা যাবে।

এসব প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম প্রস্তাবটি ছিল সবচেয়ে অযৌক্তিক এবং কেবল সেটাকেই গ্রহণ করে ১৯২৩ সালের দাম্পত্য আচরণবিধির (Matrimonial Cases Act) অধীনে তা প্রকাশ করা হয়। অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলোর কোনো একটিকেও আজ পর্যন্ত আইনের কাঠামোর অধীনে আনা হয়নি। কেননা ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ (Archbishop of Canterbury) এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি এর সাথে একমত হতে পারেননি।

ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনবিদগণের জ্ঞানের বহর এখান থেকেই অনুমান করে নিন যে, তারা পুরুষ ও নারীর যেনায় লিপ্ত হওয়ার আইনগত ও স্বভাবগত পার্থক্যটুকুও বুঝতে অক্ষম। তাদের এ ভ্রান্ত আইন প্রণয়নের বদৌলতে স্ত্রীদের পক্ষ থেকে নিজেদের স্বামীদের বিরুদ্ধে এত অধিক সংখ্যায় তালাকের দাবি উঠেছে যে, ইংল্যান্ডের আদালতসমূহ এতে অস্থির হয়ে পড়েছে এবং ১৯২৮ সালে লর্ড মেরিভ্যাল (Lord Merrivalle)-কে এর প্রতিরোধের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়েছিল।

ইউরোপ মহাদেশের যেসব রাষ্ট্রে রোমান গির্জার অধিক প্রভাব রয়েছে, সেখানে এখন পর্যন্ত 'বৈবাহিক সম্পর্ক' ছিন্ন করার মত বস্তু নয়। অবশ্য কোনো কোনো অবস্থায় আইনগত বিচ্ছেদ হতে পারে। এরপর স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর মিলতেও পারে না, আবার স্বাধীনভাবে দ্বিতীয় বিবাহও করতে পারে না। আয়ারল্যান্ড ও ইতালীর দাম্পত্য আইন ব্যবস্থা এ মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল।

ফ্রান্সের দাম্পত্য আইন অনেক উত্থান-পতন দেখেছে। ফরাসী বিপ্লবের পর তালাকের ব্যাপারটিকে খুবই সহজ করে দেয়া হয়েছে। নেপোলিয়ন কোড (Code Nepolian)-এর ওপর কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ১৮১৬ সালে তালাককে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৮৪ সনে পুনরায় এটাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। অতপর ১৮৮৬, ১৯০৭ ও ১৯২৪ সালে এজন্য বিভিন্ন রকম আইন প্রণয়ন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তালাকের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো স্থির করা হয় ঃ

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের যেনায় লিপ্ত হওয়া, নির্মম আচরণ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের এমন কার্যকলাপ যার ফলে অপরজনের

সম্মানের হানি হয়, দাম্পত্য অধিকার আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, শরাব পানের বদভ্যাস ও আদালতের মাধ্যমে এমন শাস্তির যোগ্য হওয়া যা অত্যন্ত অপমানজনক।

এছাড়া আদালত থেকে তালাকের ডিক্রী লাভ করার পর স্ত্রীর জন্য তিন শত দিনের ইদ্দাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা ইসলামী আইনেরই ক্রটিপূর্ণ অনুকরণ।[৫৬]

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তালাকের বিধান পরস্পর থেকে অনেকটা ভিন্নতর, কিন্তু অপূর্ণাংগ ও ভারসাম্যহীন হওয়ার ব্যাপারে সবগুলোই সমান।

অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও নরওয়েতে স্বামী-স্ত্রী কেবল পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই তালাকের ডিক্রী লাভ করতে পারে। ইসলামের খোলা ব্যবস্থার সাথে এর কিছুটা মিল আছে, কিন্তু তাও ক্রটিপূর্ণ অনুকরণ মাত্র।

জার্মানীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের অপরজনকে পরিত্যাগ করা এবং তার সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকাটাই তালাকের জন্য যথেষ্ট নয়—যতক্ষণ এ অবস্থা একাধারে এক বছর পর্যন্ত চলতে না থাকে। এ আইন হচ্ছে ইসলামের ঈলা ব্যবস্থার একটা অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। সুইজারল্যান্ডে এর জন্য তিন বছরের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং হল্যান্ডে (নেদারল্যান্ডস) পাঁচ বছর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের আইন এ ব্যাপারে নীরব।

নিখোঁজ স্বামীর ক্ষেত্রে সুইডেনের আইন অনুযায়ী স্ত্রীকে ছয় বছর পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং হল্যান্ডে দশ বছর। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের আইন নীরব।

পাগলের ক্ষেত্রে জার্মানী, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের আইনে তিন বছরের অবকাশ রয়েছে। অন্যান্য দেশ পাগলের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

---

৫৬. ইদ্দাত পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—এক পুরুষের বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর অপর পুরুষের বিবাহ বন্ধনে যাওয়ার পূর্বে নারী গর্ভবতী কি না তা নিশ্চিত হওয়া। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলাম সম্পূর্ণরূপে স্বভাবসম্মত পন্থা অবলম্বন করেছে। তা হচ্ছে, তিনটি মাসিক ঋতু (হায়েয) অতিক্রান্ত হলেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। অবশ্য স্ত্রীলোকটি যদি অন্তঃসত্তা হয় তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দাত প্রলম্বিত হবে—এমনকি তালাকের দশ দিন পরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হোক না কেন। এর বিপরীতে তিন শত দিন অথবা দশ মাস পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করার কোনো স্বভাবসম্মত ভিত্তি নেই।—গ্রন্থকার

বেলজিয়ামে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ মাস ইদ্দাত পালন করতে হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়াম ছাড়া অন্য কোনো দেশে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহের জন্য ইদ্দাত নির্দিষ্ট নেই।

অস্ট্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের পাঁচ বছর অথবা ততোধিক সময়ের জন্য কারাদণ্ড হওয়া তালাক দাবি করার জন্য যথেষ্ট। বেলজিয়ামে কেবল শাস্তির দণ্ড হওয়াই স্বামী অথবা স্ত্রীকে নিজ সংগীর বিরুদ্ধে তালাকের ডিক্রী লাভ করার অধিকারী বানিয়ে দেয়। সুইডেন ও হল্যান্ডে এর জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শর্ত।

দুনিয়ায় যাদেরকে সবচেয়ে উন্নত মনে করা হয় এটা হচ্ছে সেই সব জাতিরই আইন। এর ওপর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যায়, তাদের কেউই একটি পূর্ণাংগ ও ভারসাম্যপূর্ণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সফল হয়নি। তাদের বিপরীতে যে ব্যক্তি ইসলামী আইনের দিকে ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকাবে, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ন্যায়-ইনসাফের ভারসাম্য, মানব প্রকৃতির বিবেচনা, বিপর্যয়ের মূলোৎপাটন, চরিত্র-নৈতিকতার হেফাযত, সামাজিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিদান এবং দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় সমস্যা ও আচরণের ওপর পূর্ণাংগভাবে ব্যাপৃত হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী আইন যে পরিমাণ পূর্ণতায় পৌঁছেছে—পাশ্চাত্য শুধু এককভাবেই নয়, বরং সমষ্টিগতভাবেও এর দশ ভাগের এক ভাগের পূর্ণতায়ও পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। অথচ এ আইন উনিশ শতকের 'আলো'র যুগে পাশ্চাত্যের হাজার হাজার পাদ্রী ও বুদ্ধিজীবী প্রায় এক শতাব্দীর অনুসন্ধান, চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও আইনগত অভিজ্ঞতা অর্জন করার পরই রচনা করেছেন। আর ইসলামী আইন-বিধান আজ থেকে তের শত বছর পূর্বে প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেদুইন আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তি কোনো পার্লামেন্ট অথবা কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেননি।

এরূপ সুস্পষ্ট ও বিরাট পার্থক্য অবলোকন করার পরও যদি কোনো ব্যক্তি বলে, ইসলামের আইন আল্লাহর দেয়া বিধান নয়, বরং মানুষের তৈরি বিধান, তাহলে আমরা বলবো—এরূপ ব্যক্তির তো খোদায়ী দাবি করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর সত্যবাদিতার এর চেয়ে অধিক স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, তিনি স্বয়ং এরূপ অতিমানবীয় অবদানের কৃতিত্ব নেননি, বরং তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, "আমি আমার মন-মগজ থেকে কিছুই পেশ করতে পারি না, আল্লাহ তাআলা আমাকে যা কিছু শেখান তাই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই।"

অতপর এরূপ সুস্পষ্ট ও বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ যদি নিজের জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে স্রষ্টার পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এবং নিজেকেই নিজের পথপ্রদর্শক ও আইনপ্রণেতা হওয়ার দাবি করে, তাহলে তার এ হঠকারিতাকে আহাম্মকী ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? তার চেয়ে বড় আহাম্মক আর কে হতে পারে যাকে সহজ-সরল পথ বলে দেয়ার জন্য একজন নিঃস্বার্থ ও হিতাকাঙ্ক্ষী পথপ্রদর্শক সদা প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু সে বলে, "আমি নিজেই রাস্তা খুঁজে নেব।" আর খোঁজাখুজি করতে গিয়ে অযথা সে বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরপাক খেতে থাকে।